Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জামিলা আক্তার

রোলঃ 23090121176

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জামিলা আক্তার

রোলঃ 23090121176

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জামিলা আক্তার, আইডিঃ 23090121176 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

জামিলা আক্তার

আইডিঃ 23090121176

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

সন্তান মাতা পিতার কাছে আল্লাহর দেয়া গুরুত্বপূর্ণ আমানতঃ 7

সন্তান-সন্ততি দানের মাধ্যমে বান্দার উপর আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষা 11

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতা উভয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ 12

নিজ সন্তানদের জন্য নবীগণের দুআ- 21

সন্তানের পৃথিবীতে আগমনের পূর্ববর্তী অধিকার সমূহ 34

পৃথিবীতে আগমনের পরবর্তী অধিকার সমূহঃ 37

আল-কুরআনের আলোকে সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্য সম্পর্কিত উক্তিঃ 45

আল-হাদিসের আলোকে সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্য সম্পর্কিত উক্তিঃ 48

সন্তানকে আগে শিক্ষাদান পরে শাসন 56

সন্তানদের শাসনের নীতি 59

শিশুর মন-মানস এবং স্বভাব-প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রাখা 62

তাম্বীহ ও শাস্তির ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রম অনুসরণ করা 63

সন্তানদের সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 64

সন্তানদের দুনিয়াবিমুখতার তরবিয়ত 68

সন্তানদের নেক আমলের উৎসাহ প্রদানঃ 71

সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা সংক্রান্ত মা বাবার ভুলভ্রান্তিঃ 72

উপসংহার 80

ভূমিকা

আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি কণা আল্লাহর দান। জীবনের প্রতিটি বিন্দু আল্লাহর দয়া। তাই আমাদের অস্তিত্ব ও জীবন আল্লাহর কাছে ঋণী। আমাদেরকে আল্লাহ অফুরন্ত নিআমত দান করেছেন। আল্লাহর অফুরন্ত নিআমতরাজির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি নিআমত হল আমাদের সন্তানেরা। নিঃসন্তান দম্পতি কিংবা সন্তানহারা মাকে জিজ্ঞেস করলে আমরা বুঝতে পারবো সন্তান কত বড় নিআমত।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেনঃ

وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَ حَفَدَةً وَّ رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ.

আল্লাহ তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের স্ত্রীদের থেকে তোমাদের জন্য পুত্র ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন। আর ভালো-ভালো জিনিসের থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। তবুও কি তারা ভিত্তিহীন জিনিসের প্রতি ঈমান রাখবে আর আল্লাহর নিআমতসমূহের অকৃতজ্ঞতা করবে? (সূরা নাহল - ১৬ : ৭২)

আল্লাহ যাকে দান করেন সে-ই কেবল এ নিআমতের অধিকারী হতে পারে।

ইরশাদ হয়েছেঃ

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ، يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ، يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّ اِنَاثًا، وَ يَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا، اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ.

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। যাকে চান কন্যা দেন এবং যাকে চান পুত্র দেন। অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই। আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। (সূরা শুরা - ৪২ : ৪৯-৫০)

সন্তান আল্লাহ তা'আলার অগণিত নেয়ামতের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেয়ামত ও তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ। আল্লামা আলূসী (রহঃ) বলেছেন, 'ধন-সম্পদ হচ্ছে প্রাণ বাঁচানোর উপায় আর সন্তান-সন্ততি হচ্ছে বংশ তথা মানব প্রজাতি রক্ষার মাধ্যম'।

সালমান ফারেসী (রাঃ) বলেন,

إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّه.

'তোমার উপর তোমার রবের হক রয়েছে, তোমার শরীরের হক রয়েছে এবং তোমার পরিবারের হক রয়েছে। অতএব প্রত্যেককে তার অধিকার দাও'।

রাসূল (সাঃ)-এর কাছে সালমান (রাঃ)-এর এ বক্তব্য পেশ করা হ'লে তিনি বলেন, 'সালমান সত্য বলেছে'। কারণ মানব সন্তান পশু-পাখির মত নয় বিধায় তারা পুরোপুরি আদর-যত্ন, স্নেহ-মমতা না পেলে তাদের পক্ষে পৃথিবীতে বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব। সন্তান পিতা-মাতার যৌথ ফসল। মহান আল্লাহ তা'আলার সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি মানব সন্তান পিতা-মাতার নিকট পবিত্র আমানত। পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে যাদের প্রচুর সম্পদ রয়েছে, কিন্তু তা ভোগ করার মতো কোন উত্তরাধিকারী নেই। তারা হাজারও চেষ্টা-সাধনা ও কামনা করে একটি সন্তান লাভ করতে পারছে না। অপরপক্ষে বহু লোক আছে যাদের যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ না থাকা সত্ত্বেও বহু সংখ্যক সন্তানের জনক। সন্তান লাভ করা আল্লাহর পক্ষ হ'তে এক বিশেষ নেয়ামত।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ إِنَاثاً وَّيَهَبُ لِمَن يَّشَاءُ الذُّكُوْرَ- أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَّإِنَاثاً وَّيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْماً إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ.

'আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে করে দেন বন্ধ্যা। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান' *(শূরা ৪২/৪৯-৫০)*।

সন্তান মাতা পিতার কাছে আল্লাহর দেয়া গুরুত্বপূর্ণ আমানতঃ

মাতা পিতার কাছে সন্তান কত প্রিয় তা বোঝানোর যোগ্যতা সম্ভবত কোনো মানুষের নেই। ভালোবাসার চূড়ান্ত পরিসীমা বুঝাতেই মানুষ সন্তানের ভালোবাসার উপমা দিয়ে থাকে। এক আরব বেদুঈন কতইনা চমৎকার বলেছে, 'আমার সন্তান তো আমার নিজের কলিজাটিই, যা বক্ষ থেকে বের হয়ে জমিনে চলাফেরা করছে।' কিয়ামত দিবসের বিভীষিকা বুঝাতে আল্লাহ তাআলা সন্তানের ভালোবাসার কথা দিয়েই বুঝিয়েছেন যে, সন্তান এত প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও সেদিন পিতা মাতার সন্তানেরও খোঁজ রাখার সুযোগ হবে না। মা তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসার সীমা বুঝাতেও কুরআন-হাদীসে সন্তানের এ ভালোবাসা দিয়েই বুঝানো হয়েছে যে, স্বীয় সন্তান থেকেও এঁদেরকে বেশি ভালোবাসতে হবে। জোড়াবদ্ধ হওয়ার পর প্রতিটি জোড়ার এটাই আকাঙ্খা থাকে যে তাদের কোল জুড়ে নতুন কেউ আসবে। ফুটফুটে চেহারায় স্বচ্ছ কোমল অন্তর নিয়ে হাসবে। একটু বিলম্ব হলে প্রতীক্ষার প্রহর যে আর শেষ হয় না। অস্থির হয়ে যায়, কখন নতুন মুখটি আসবে। আর যখন সে দুনিয়াতে আসে ঘরের সবাই তো খুশিই, তবে মাতা-পিতার যে কী পরিমাণ খুশি তা বলে বুঝানো সম্ভব নয়। সন্তানটি তাদের কলিজার টুকরা, গর্বের ধন। একে আমাদের মতো করে গড়ে তুলব। তাকে আমরা এটা বানাব ওটা বানাব ইত্যাদি ইত্যাদি। এ হল সন্তান নিয়ে ভাবনার এক পিঠ এবং সাধারণত এটিই দৃশ্যমান। তবে এক্ষেত্রে আরেকটি দিক আছে, এবং সেটিই হল আসল ও গুরুত্বপূর্ণ। তবে তা সাধারণত আমাদের ভাবনার বাইরে থেকে যায়। এক সময় মানুষ ছিল না, দুনিয়াও ছিল না। জান্নাত-জাহান্নামও ছিল না। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলেন মানুষ সৃষ্টি করবেন, উদ্দেশ্য- তারা তাঁর ইবাদত-আনুগত্য করবে, নেক কাজ করবে, মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকবে, অতপর তাঁর ইচ্ছা ও দয়ায় চিরস্থায়ী জান্নাতে বসবাস করবে। তাই তিনি দুনিয়া সৃষ্টি করলেন, জান্নাত-জাহান্নাম তৈরি করলেন। তো এ মানুষ কীভাবে সৃষ্টি করবেন, তিনি চাইলে তো প্রথম মানুষ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষকে একবারেই একসাথে সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেভাবে না করে প্রথমে একজন (আদম আঃ) সৃষ্টি করলেন। এরপর তাঁর থেকে তার স্ত্রীকে। অতপর এঁদের থেকে মানুষ সৃষ্টি হবে। এদের থেকে যারা সৃষ্টি হবে তাদের থেকেও একইভাবে মানুষ সৃষ্টি হবে। এভাবে মানুষ সৃষ্টির ধারা অব্যাহত থাকবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা চলতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা মানুষকে একসাথে সৃষ্টি না করে এভাবে মা-বাবার মাধ্যমে সৃষ্টি করার রহস্য তো অনেক আছে। তবে সাদামাটাভাবে যে হেকমতটি সহজে বোঝা যায় এবং যার ফলাফল সবার সামনে, তা হল এভাবে সৃষ্টিতে মানুষ একে অপরের সাথে সৃষ্টিগতভাবে সম্পৃক্ত হয়, ফলে

তাদের মাঝে আত্মীয়তা, হৃদ্যতা, অন্তরঙ্গতা, একে অপরের সহযোগিতার সম্পর্ক ও টান তৈরি হয়। তাই কেউ কারো পিতা-মাতা হয়, কেউ সন্তান হয়, কেউ ভাই-বোন হয় ইত্যাদি। আজ পুরো মানবজগৎ এভাবে একে অপরের সাথে যুক্ত। কিয়ামত পর্যন্ত পিতা-মাতার মাধ্যমে যে সন্তানটি দুনিয়াতে আসবে সে আল্লাহরই সৃষ্টি - মানব। তাঁরই সে সৃষ্টি, যাকে ইবাদাত-আনুগত্য ও জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ সৃষ্টি আল্লাহর, আমার হাতে সে আল্লাহর দেয়া আমানত; সে তো আল্লাহরই খলীফা, যার কথা তিনি ফেরেশতাদেরও বলেছেন। ফেরেশতাগণ নেতিবাচক কথা বললেও তিনি তাদেরকে এমন সৃষ্টির ফয়সালার কথা জানিয়ে দিয়েছেন।

وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَ یَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّیْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ.

স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি। তারা বলল, আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার সপ্রসংস স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বললেন, আমি জানি, যা তোমরা জানো না। (সূরা বাকারা - ২ : ৩০)

আল্লাহ তাআলা যখন প্রথম মানবদ্বয়কে দুনিয়াতে অবতরণ করান তখন এ বলে অবতরণ করান-

اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِیْعًا فَاِمَّا یَاْتِیَنَّكُمْ مِّنِّیْ هُدًی فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ وَالَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَ كَذَّبُوْا بِاٰیٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ.

তোমরা সকলে এখান (জান্নাত) থেকে নেমে যাও। অতপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোনো হেদায়েত আসবে তখন যারা আমার হেদায়েতের অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। আর যারা কুফরী করবে এবং আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করবে তারা জাহান্নামবাসী, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। (সূরা বাকারা - ২ : ৩৮-৩৯)

প্রেরিত মানুষ তো এখন শুধু দু'জন, কিন্তু বলা হয়েছে, তোমরা সকলে নেমে যাও, উদ্দেশ্য এ দুজনসহ এদের সকল বংশধর।

আল্লামা সুয়ূতী রাহ. এ আয়াতের পূর্বের আয়াতে-

وَ قُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

এর ব্যখ্যায় বলেন

أنتما بما اشتملتما عليه من ذريتكما,

অর্থাৎ তোমরা দুজন এবং তোমাদের ঔরসে যত সন্তান আছে সকলে অবতরণ করো। আর এ দুজনসহ আগত সকল সন্তান বা মানবকেই আল্লাহ তাআলা এ কথা বলে পাঠিয়েছেন যে, দেখো দুনিয়াতে যাওয়ার পর তোমাদের নিকট আমার হেদায়েত আসবে, আর তোমরা

তা গ্রহণ করে নিবে। প্রতিদানে আমি জান্নাত দেব, অন্যথা করলে তোমাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি। তাহলে প্রতিটি সন্তান দুনিয়াতে আসার সাথে সাথে তার প্রতি এ ঘোষণা চলে আসে- সে আল্লাহর খলীফা। আর এজন্যই তিনি প্রতিটি বনী আদমের মাঝে তাঁর ইবাদত-আনুগত্যের সর্বোপরি হেদায়েত ও জান্নাতের পথে চলার সহজাত যোগ্যতা ও শক্তি দিয়েই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। কারণ সে তাঁরই খলীফা, তাঁরই প্রিয় সৃষ্টি।

প্রসিদ্ধ হাদীসটি প্রায় সকলেরই জানা, নবীজী বলেন -

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَو ْيُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِه .ِ

প্রতিটি সন্তানই 'ফিতরাত'-এর উপর (হেদায়েত ও সত্যপথ গ্রহণের সহজাত যোগ্যতা নিয়েই) জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তার মাতা-পিতা তাকে ইহুদী বানায়, খ্রিস্টান বানায় বা অগ্নিপূজারী বানায়। (সহীহ বুখারী, হাদীস ১৩৮৫)

শুধু তাই নয় সহজাতভাবে হেদায়েতের উপর থাকতে যে বিষয়গুলো বাধা হয়ে দাঁড়ায় আল্লাহ তাআলা সেগুলো কোনো শিশুকেই (স্বভাবগতভাবে) দেননি, বাকিটা শিশু যদি পরবর্তীতে পরিবেশ থেকে শিখে নেয় তা ভিন্ন কথা। তো আমার সন্তান, কলিজার টুকরা, যাকে একমাত্র আমার মনে করছি, সে তো আমার হাতে আল্লাহর আমানত- আল্লাহর খলীফা, যাকে আল্লাহ ইবাদত-আখেরাত-জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর সে জন্যই আল্লাহ তার মাঝে সেই যোগ্যতা দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যা দিয়ে সে আল্লাহর নিকট থেকে এসে পুনরায় আল্লাহর নিকট ফিরে যেতে পারে। এ হল সন্তান নিয়ে ভাবনার আরেক দিক। আর জানা কথা এবং বাস্তবতাও এই যে, এ দিকটিই হল ভাবনার আসল দিক। সন্তানের আসল রূপ। কেননা আল্লাহ তাআলা এ মানুষের জন্যই দুনিয়ার সবকিছু সৃজন করেছেন, জান্নাত সাজিয়েছেন, জাহান্নাম বানিয়েছেন। এক সময় সমগ্র দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে একমাত্র মানুষই বাকি থাকবে। দুনিয়া তো নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী, আসল না। আসল তো আখেরাত। কিন্তু যে দিকটি মূল সে দিকে আমরা খুব কমই ভ্রুক্ষেপ করি। ভাবি না যে, সে আল্লাহরও, সে তো আল্লাহর খলীফা। আমরা সাধারণত ভাবি- এ আমার সন্তান সুতরাং তাকে আমি একান্ত আমার ইচ্ছা অনুসারে গড়ব। কে আছে বাধা দেয়ার, কার কী বলার আছে। তার উপর একমাত্র অধিকার আমার। কিন্তু যদি একটু ভেবে দেখি কে তাকে সৃষ্টি করেছেন। যাকে একমাত্র আমার মনে করছি তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মেধা ও শক্তি-সামর্থ্যসহ তার পুরো অস্তিত্ব কে দান করেছেন? পৃথিবীতে আগমনের পর তার জীবনের জন্য আলো-বাতাস-ভূমিসহ যাবতীয় আবশ্যকীয় উপকরণ কে দান করেছেন? আমি না আল্লাহ? আমি শুধু তাকে বহন করেছি, লালন-পালন করেছি। তাহলে এখন সন্তানকে কার ইচ্ছা অনুযায়ী লালন-পালন করা হবে? আমার ইচ্ছা, না আল্লাহ্র ইচ্ছা? আমি সন্তানকে আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে লালন-পালন করছি, বিজাতীয় কালচারে তাকে গড়ে তুলছি। কাল আমার

আদরের সন্তানই যদি আমার বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে নালিশ করে আমাকে সম্বোধন করে বলে- আমি অবুঝ ছিলাম তোমরা কেন আমার পথ জান্নাত থেকে ঘুরিয়ে দিলে, দ্বীন কবুলের আমার সহজাত শক্তিকে কেন বিনষ্ট করে দিলে?

সন্তান আল্লাহর দান। আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় এক আমানত। আল্লাহ এর মাধ্যমে পরীক্ষা করেন বান্দা এই আমানতের যথাযথ হেফাযত করে কি না।

সন্তান-সন্ততি দানের মাধ্যমে বান্দার উপর আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষা

সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে দুইভাবে পরীক্ষা করেন।

(এক) সন্তানের কারণে বান্দা আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করে কি না;

(দুই) বান্দা সন্তানকে আমানত মনে করে কি না এবং সে আমানতের হেফাযতে যত্নবান হয় কি না।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، وَّ اَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ.

জেনে রেখো, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা। আর মহা পুরস্কার রয়েছে আল্লাহরই কাছে। (সূরা আনফাল - ৮ : ২৮)

ইমাম ইবনে জারীর তবারী রাহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাদের লক্ষ্য করে বলছেনঃ

واعلموا، أيها المؤمنون! إنما أموالكم التي خَوَّلَكُمُوها اللهُ، وأولادُكم التي وَهَبَها اللهُ لكم، اختبارٌ وبلاء، أَعْطاكُمُوها ليَختبرَكم بها ويَبتلِيَكم، لينظر كيف أنتم عاملون من أداء حق الله عليكم فيها، والانتهاء إلى أمره ونهيه فيها.

হে মুমিনগণ! জেনে রেখ, তোমাদেরকে যে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দান করেছি এসব তোমাদের জন্য পরীক্ষার বস্তু। এর মাধ্যমে তোমাদের আমি পরীক্ষা করব। এটা দেখার জন্য যে, সন্তান-সন্ততি ও অর্থ-কড়ির ক্ষেত্রে তোমরা আল্লাহর হক কতটুকু আদায় কর এবং দ্বীনের বিধিনিষেধ কী পরিমাণ মান্য কর। (তাফসীরে তাবারী ১১/১২৬)

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

أَلاَ كُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ،... وَالرّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ،... أَلاَ فَكُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ.

শুনে রাখো, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। পুরুষ তার পরিবারের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। নারী তার পরিবার, সন্তান-সন্ততির বিষয়ে দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। জেনে রাখো, প্রত্যেক ব্যক্তিই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১৩৮; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৯২৮)

আরেক হাদীসের ঘোষণা

ما مِن عبد اسْتَرْعاه اللهُ رعيّةً، فلم يَحُطْها بنصيحة، إلا لم يجدْ رائحة الجنة.

আল্লাহ তাআলা যদি বান্দাকে কারো দায়িত্বশীল বানান আর সে নিজ অধীনস্তদের কল্যাণের ব্যাপারে যত্নশীল না হয়, তাহলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১৫০)

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতা উভয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিআমত এবং পিতা-মাতার নিকট আমানত। পিতা-মাতার নিকট থেকে স্নেহ-মমতাসহ সন্তানের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাবার অধিকার আছে। পিতা-মাতার কর্তব্য হল, সন্তানকে আল্লাহর ফরমাবরদার বান্দা হিসাবে গড়ে তোলা এবং শয়তানের সবধরনের গোলামি থেকে দূরে রাখা। শয়তান চায়, প্রত্যেকটা মানবশিশুকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করতে। জান্নাত থেকে বিতাড়িত হওয়ার সময়ই তার অঙ্গিকার ছিল আদমসন্তানকে বিপথগামী করা।

তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বলেছিলেনঃ

وَ شَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا.

যাও তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অংশীদার হয়ে যাও এবং তাদেরকে যত পারো প্রতিশ্রুতি দাও। বস্তুত শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়। (সূরা ইসরা - ১৭ : ৬৪)

অর্থাৎ শয়তান চাইবে সম্পদ ও সন্তানকে বিপথে পরিচালিত করতে। কিন্তু বান্দাকে আল্লাহ তাআলা সে সম্পর্কে আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন। অভিভাবকের কর্তব্য পালনের মূল পর্বটা এখানে এসেই আবর্তিত হয়।

শিশুরা যেকোনো জিনিস খুব সহজে ধারণ করতে পারে। তাদের স্মৃতিতে তা যেন খোদাই হয়ে যায়।

গুণীজনেরা যথার্থই বলেছেন,

‘শৈশবের শিক্ষা যেন পাথরে অংকিত নকশা।’ সুতরাং সন্তানকে সুসন্তান হিসাবে গড়ে তোলার মূল সময় হচ্ছে শৈশব কাল।

১। সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করাঃ

পিতা-মাতার দুআ আল্লাহ তাআলা কবুল করেন।

হাদীস শরীফের ইরশাদ-

ثلاثُ دعواتٍ مستجاباتٌ لا شكّ فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم.

তিন ব্যক্তির দুআ কবুল হয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

পিতা -মাতার দুআ,

মুসাফিরের দুআ ও

মজলুমের দুআ।

(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৫৩৬; জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯০৫; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১০১৯৬)

২। সন্তানের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করাঃ

ক। সন্তান জন্মের আগের দোয়া,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

প্রত্যেক আদম সন্তানের জন্মের সময় তার পার্শ্বদেশে শয়তান তার দুই আঙ্গুল দ্বারা খোঁচা মারে। [সহীহ বুখারী ৩২৮৬]

সৎ, আদর্শ, নিষ্ঠাগণ ও উত্তম সন্তানের প্রত্যাশা সবার থাকে। তাই মা-বাবার উচিত এমন সন্তানের জন্য দোয়া করা।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছেঃ

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নেককার সন্তান দিন। [সুরা আস-সাফফাত, আয়াত: ১০০]

খ। সন্তান জন্মের পর দোয়াঃ

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবী সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম হাসান এবং হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা এর জন্য নিম্নোক্ত দোয়া পড়ে পানাহ চাইতেন। আর বলতেন তোমাদের পিতা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, ইসমাইল ও ঈসা আলাইহিস সালামের জন্য দোয়া করে পানাহ চাইবে।

أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

অর্থ: "আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমার দ্বারা প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং প্রত্যেক কুদৃষ্টির অনিষ্ট হতে পানাহ চাচ্ছি।" [সহীহ বুখারী ৩]

৩। দ্বীনদারীতে যত্নবান হওয়ার দোয়াঃ

সন্তান যেনো দ্বীনদার হয় এবং উদাসীন না হয় সেজন্য দোয়া করতে হবে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَ

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নামাজ আদায়কারী করুন এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও। হে আমার প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা কবুল করুন। [সুরা ইবরাহিম, আয়াত: ৪০]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন **তিন** প্রকারের দুআ অবশ্যই মন্জুর করা হয়, তাতে কোনরকম সন্দেহ নেই।

নির্যাতিত ব্যক্তির দুআ,

মুসাফিরের দু'আ এবং

সন্তানের প্রতি বাবা ও মায়ের দুআ। [সুনান আত তিরমিজী **১৯০৫**]

৪। জন্মের পর সন্তানের ডান কানে আজান ও বাম কানে ইকামত দেওয়াঃ

নবজাতকের কানে আযান দেওয়া সুন্নত আবু রাফি রাঃ বলেনঃ

"আমি দেখলাম, ফাতেমা (রা) যখন হাসানকে জন্ম দিলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসানের কানে নামাযের আযানের মত আযান দিলেন।"

তবে বাম কানে ইকামত দেওয়ার বর্ণনাটি জাল পর্যায়ের।

হাদিসটি নিম্নরূপঃ

"যদি কারো সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং সে তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত দেয় তবে 'উম্মুস সিবইয়ান' (জিন) তার ক্ষতি করবে না।"

৫। তাহনিক করাঃ

ইমাম নববী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ

সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে খেজুর দিয়ে তাহনিক করা সুন্নত। অর্থাৎ খেজুর চিবিয়ে নবজাতকের মুখের তালুতে আলতোভাবে মালিশ করা এবং তার মুখ খুলে দেওয়া, যাতে তার পেটে এর কিছু অংশ প্রবেশ করে। তিনি বলেন, কতক আলেম বলেছেন, খেজুর সম্ভব না হলে অন্য কোনো মিষ্টি দ্রব্য দিয়ে তাহনিক করা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন, সবার নিকটই তাহনিক করা মুস্তাহাব, আমার জানা মতে এ ব্যাপারে কেউ ভিন্ন মত পোষণ করেন নি।

আনাস (রাঃ) বলেনঃ

আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ তালহা ভূমিষ্ঠ হলে আমি তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে গেলাম। তিনি বলেন, তোমার সঙ্গে কি খেজুর আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর চিবালেন। অতঃপর তা বের করে বাচ্চার মুখে দিলেন। বাচ্চাটি জিব্বা দিয়ে চুসে ও ঠোটে লেগে থাকা অংশ চেটে খেতে লাগল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দৃশ্য দেখে বলেন, দেখ, আনসারদের খেজুর কত প্রিয়!

আবু মুসা (রাঃ) বলেনঃ

আমার এক সন্তানের জন্ম হলে, আমি তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট নিয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম রাখেন ইবরাহিম। অতঃপর খেজুর দিয়ে তাহনিক করেন, তার জন্য বরকতের দো'আ করেন এবং আমার কাছে ফিরিয়ে দেন। এটা আবু মুসার বড় সন্তানের ঘটনা।

৬। নবজাতকের সুন্দর নাম রাখাঃ

শিশু জন্মের পর তার জন্য একটি সুন্দর ইসলামী নাম রাখা প্রত্যেক মুসলিম পিতা-মাতার কর্তব্য। ব্যক্তির নাম তার স্বভাব চরিত্রের উপর ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে বলে বর্ণিত আছে।

শাইখ বকর আবু জায়েদ বলেনঃ

"ঘটনাক্রমে দেখা যায় ব্যক্তির নামের সাথে তার স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের মিল থাকে। এটাই আল্লাহর তা'আলার হেকমতের দাবী। যে ব্যক্তির নামের অর্থে চপলতা রয়েছে তার চরিত্রেও চপলতা পাওয়া যায়। যার নামের মধ্যে গাম্ভীর্যতা আছে তার চরিত্রে গাম্ভীর্যতা পাওয়া যায়। খারাপ নামের অধিকারী লোকের চরিত্রও খারাপ হয়ে থাকে। ভাল নামের অধিকারী ব্যক্তির চরিত্রও ভাল হয়ে থাকে।"

নবজাতকের নাম রাখার সময়কালের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে **তিনটি** বর্ণনা রয়েছে।

১। শিশুর জন্মের পর পরই তার নাম রাখা,

২। শিশুর জন্মের তৃতীয় দিন তার নাম রাখা,

৩। শিশু জন্মের সপ্তম দিন তার নাম রাখা।

এর থেকে এটাই প্রমানিত হয় যে ইসলাম এই বিষয়ে মুসলিমদেরকে অবকাশ দিয়েছে যে কোনোটির উপর আমল করা যেতে পারে। এমনকি কুরআনে আল্লাহতায়ালা কোন কোন নবীর নাম তাদের জন্মের পূর্বে রেখেছেন। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বর্ণিত হয়েছে

"তোমাদের নামসমূহের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে- আব্দুল্লাহ (আল্লাহর বান্দা) ও আব্দুর রহমান (রহমানের বান্দা)।"

এই নাম দুইটি আল্লাহর প্রিয় হওয়ার কারণ হলো এ নাম দ্বয়ে আল্লাহর দাসত্বের স্বীকৃতি রয়েছে। তাছাড়া আল্লাহ সবচেয়ে সুন্দর দুটি নাম এ নাম দ্বয়ের সাথে সম্বন্ধিত আছে। এই কারণে আল্লাহর অন্যান্য নামের সাথে আল্লাহর বান্দা বা দাস শব্দটিকে সম্বন্ধিত করে নাম রাখাও উত্তম।

হাদিসে এসেছে নবী সাঃ বলেছেন,"তোমরা আমার নামে নাম রাখ। আমার কুনিয়াতে (উপনামে) কুনিয়ত রেখো না।"

৭। সন্তানের আকিকা দেয়াঃ

আকিকার আভিধানিক অর্থ আল্লাহর দরবারে নজরানা পেশ করা, শুকরিয়া আদায় করা, জানের সদকা দেওয়া ও আল্লাহর নিয়ামতের মোকাবেলায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। ইসলামী পরিভাষায় আকিকা হচ্ছে নবজাতকের পক্ষ থেকে পশু যবেহ করা।

ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহ আলাইহি বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

যার সন্তান হয় সে যদি সন্তানের পক্ষ থেকে আকীকা করতে চায়, তবে তা করা উচিত। তিনি আরো বলেন, প্রত্যেক সন্তান তার আকিকার বিনিময়ে বন্ধক হিসেবে রক্ষিত। সপ্তম দিন তার পক্ষ থেকে আকিকা কর, নাম রাখ ও চুল কর্তন কর।

ছেলের পক্ষ থেকে দুইটি ও মেয়ের পক্ষ থেকে একটি বকরি আকিকা করা সুন্নত। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত;

ছেলের পক্ষ থেকে প্রতিদান হিসেবে দু'টি বকরি ও মেয়ের পক্ষ থেকে একটি বকরি আকিকা করা সুন্নত। জন্মের সপ্তম দিন, সম্ভব না হলে ১৪তম দিন বা ২১তম দিন আকিকা করা সুন্নত।

বুরায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, সপ্তম দিন অথবা চতুর্দশ দিন অথবা একুশতম দিন আকিকা কর।

৮। সন্তান জন্মের পর সপ্তম দিন মাথামুণ্ডন করা ও চুলের ওজন পরিমাণ রুপা সদকা করাঃ

আনাস (রাঃ) বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সপ্তম দিন হাসান ও হুসাইনের চুল কাটার নির্দেশ দেন এবং চুলের ওজন পরিমাণ রৌপ্য সদকা করেন। ছেলে কিংবা মেয়ে হোক জন্মের সপ্তম দিন চুল কাটা সুন্নত।

সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রত্যেক সন্তান তার আকিকার বিনিময়ে বন্ধক হিসেবে রক্ষিত। অতএব, সপ্তম দিন তার পক্ষ থেকে আকিকা কর, তার চুল কাট ও তার নাম রাখ।

নবজাতকের চুলের ওজন পরিমাণ সদকা পড়া সুন্নত। আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসানের পক্ষ থেকে দু'টি বকরি আকিকা দিয়েছেন এবং বলেছেন, হে ফাতেমা, তার মাথা মুণ্ডন কর ও তার চুলের ওজন পরিমাণ রৌপ্য সদকা কর।

হাফেজ ইবন হাজার আসকালানী রহমতুল্লাহি বলেন,

সব বর্ণনাতে রৌপ্যের কথাই এসেছে। (তালখিসুল হাবির) হ্যাঁ, অবশ্য কোনো কোনো বর্ণনাতে রৌপ্য বা স্বর্ণ সদকার কথাও বলা হয়েছে।

৯। সন্তানকে ছোটবেলা থেকে ইসলামিক শিক্ষায় বড় করে তোলাঃ

দ্বীনি শিক্ষা দেয়া, কুরআন শিক্ষা দেয়া, কোরআন বুঝে পড়ার গুরুত্ব বুঝানো, পরিবারের সদস্য সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে নিয়মিত তালিম করা, কোরআনের তাফসীর হাদিস ওলামায়ে কেরামের লিখিত বিভিন্ন জীবন পরিবর্তনকারী বই নিয়ে আলোচনা করা, সন্তানদের করতে দেওয়া ও তারা পড়ে সবাইকে শুনানো দরকার।

হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর। যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাকূল। আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তারা সে ব্যাপারে তার অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়। (সূরা তাহরীম আয়াত ৬)

১০। উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়াঃ

রাসুলুল্লাহ (সা.) এ বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক করে বলেছেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ করো। (বুখারি, হাদিস : ২৫৮৭)

হযরত আমর ইবনে শুয়াইব রা থেকে বর্ণিত হয়েছে,হযরত রাসুল (সঃ)এরশাদ করেছেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদের সালাতের জন্য নির্দেশ দাও, যখন তারা সাত বছরে পৌঁছে। আর দশ বছর হলে তাকে প্রয়োজনে প্রহার করো, আর তাদের মাঝে বিছানা পৃথক করে দাও। (আবু দাউদ : ৪৯৫)।

১১। সন্তানের ভরণপোষণ দেয়াঃ

নবী সাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন,
সাওয়াবের আশায় কোন মুসলিম যখন তার পরিববার-পরিজনের জন্য খরচ করে, তা সাদাকায় পরিগণিত হয়। (সহীহ বুখারী ৫৩৫১)

১২। সন্তানদের উপযুক্ত হলে বিয়ে দেয়াঃ

আল্লাহতালা পবিত্র কুরআনে বলেন,
আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস দাসীদের বিবাহ দাও। তারা অভাবী হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও মহাজ্ঞানী। (সূরা আন-নূর আয়াত ৩২)
আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,
তোমরা যে ব্যক্তির দীনদারী ও নৈতিক চরিত্রে সন্তুষ্ট আছ তোমাদের নিকট সে ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব করলে তবে তার সাথে বিয়ে দাও। তা যদি না কর তাহলে পৃথিবীতে ফিতনা-ফ্যাসাদ ও চরম বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। [সুনান আত তিরমিজী ১০৮৪]

১৩। সন্তান বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রির দিনদারিতা দেখাঃ

মা-বাবা হিসেবে সন্তানের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হলো সন্তান যেন ভালো মানুষ হয় সেই আশায় জীবনসঙ্গিনী হিসেবে যাকে নির্বাচন করা হয় সে যেন আল্লাহভিরু হয় মুত্তাকী হয়। মা দ্বীনদার হলে সন্তান-সন্ততি দ্বীনদার হওয়ার অনেক সম্ভাবনা থাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেছেন,
চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে মেয়েদেরকে বিয়ে করা হয়ঃ
১। তার সম্পদ,
২। তার বংশমর্যাদা,
৩। তার সৌন্দর্য ও
৪। তার দ্বীনদারী।
সুতরাং তুমি দ্বীনদারীকেই প্রাধান্য দেবে নতুবা তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সহীহ বুখারী ৫০৯০)
সন্তানদের কথা চিন্তা করে জীবনসঙ্গিনী নির্বাচন করা এবং সন্তানদের ভালো পরিবেশে বড় হয়ে ওঠে এর জন্য সেরকম পরিবেশ নিশ্চিত করা - এটা সন্তানের অধিকার। সন্তান-সন্ততি বেশিরভাগ নষ্ট হয় বাবা-মার ত্রুটি থেকে। অর্থ, সামাজিক অবস্থা, রূপ লাবণ্য কোনটাই সারা

জীবন উপভোগ্য থাকে না। আর সন্তান যদি মানুষের মতো মানুষ হয় সেটা সম্ভব হয় বাবা-মার দায়িত্বশীলতার কারণে।

১৪। সন্তানদের মধ্যে সমতা বজায় রাখাঃ

নিজের সন্তানদের মাঝে সমতা ও ইনসাফ রক্ষা করা মা-বাবার উপর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এটি ইসলামের অনন্য বিধান। প্রত্যেক মা-বাবা যেমন কামনা করেন তার সন্তানরা সবাই যেন তার সঙ্গে ভালো আচরণ করে অনুরূপভাবে সন্তানরাও চায় তাদের মা বাবা তাদের সবার সঙ্গে ও সমতা বজায় রাখবেন। তাদেরকে বৈষম্যের স্বীকার করবেন না। কেননা অসম আচরণে সন্তানদের অনুভূতিতে আঘাত লাগে। তখন সন্তানদের একে অন্যের প্রতি দুঃখ, ,ঘৃণা ও বিভিন্ন নেতিবাচক মনোভাবের মধ্যে সৃষ্টি হয়।

নোমান ইবনে বশির (রাঃ)থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,
তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সমান আচরণ করো; তোমাদের সন্তানদের সঙ্গে ইনসাফ করো। (আবু দাউদ, হাদিস : ৩৫৪৪)
সন্তানদের মধ্যে দান দক্ষিণায় কাউকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,
“তোমার সন্তানেরা তোমার সাথে সমান সদাচরণ করুক তা কি তোমাকে আনন্দিত করবে না”? [ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৩৭৫; আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৫৪

১৫। সন্তানের ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখতে পেলে তাদের সংশোধন করা

উদাহরণ স্বরূপ নাবালেগ সন্তান বালেগ হওয়ার পরও নামায পড়ে না। রোযা রাখে না, যাকাত দেয় না, মেয়েরা পর্দা করে না। সবাই স্বেচ্ছাচারিতার সাথে জীবন-যাপন করে, আর মা-বাবা বসে বসে তা দেখে, কিছুই বলে না। বরং মাঝে মাঝে বলে যে, আমরা তো আমাদের দায়িত্ব পালন করে দিয়েছি। মনে রাখবেন, প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করিনি। বরং আমরা আমাদের দায়িত্বে অনেক অবহেলা করেছি, করছি এবং করেই চলছি। যার ফলে দিন দিন আমাদের গোনাহের কুফল বেড়েই চলেছে।
মনে রাখবেন, মা-বাবা যদি দুনিয়া থেকে চলে যায় আর সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং গোনাহে লিপ্ত থাকে তাহলেও মা-বাবা -যদি দায়িত্বে অবহেলা করে থাকেন- তাদের দায়িত্বে অবহেলা করার কারণে এর কিছু দায়ভার তাদের উপরও বর্তাবে।
আমাদের সকলেরই আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে। তিনি আমাদেরকে কেবল এই দায়িত্ব দেননি যে, নিজে শরীয়তের পাবন্দ হব এবং আল্লাহর বিধি-বিধান পালন করব।

বরং নিজের পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি এমনকি অধীনস্থদেরসহ সবার জিম্মাদারী আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর দিয়েছেন।
আল্লাহ তাআলা বলছেন, তোমরা নিজে জাহান্নাম থেকে বাঁচো এবং পরিবারকে বাঁচাও। আর এই জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায় হল, সন্তানের প্রতি শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত হকসমূহ পালন করা। আর এই হুকুক সন্তান জন্মলাভের পর থেইে শুরু হয়ে যায়।

সন্তানের লালন, পরিপুষ্টি, সংরক্ষণ, পরিবৃদ্ধি সর্বোপরি আল্লাহর মর্জি মোতাবেক একজন সুন্দর মানুষ হিসাবে তার জীবন গঠন করার দায়িত্ব মাতা-পিতা উভয়ের। শিশুকে বড় করে তোলার ক্ষেত্রে পিতা-মাতা পরস্পর পরিপূরক দায়িত্ব পালন করেন। উপার্জন, শাসন, নিয়ন্ত্রণ ও বহিরাঙ্গনের শ্রমসাধ্য দায়িত্ব পিতাকে পালন করতে হয়। অভ্যন্তরীণ কাজ-কর্ম, শিশুর লালন-পালন ও প্রাথমিক শিক্ষার মত মৌলিক ও ধৈর্যসাধ্য কাজগুলি সাধারণতঃ মায়ের উপর বর্তায়। শিশু নির্দোষ প্রকৃতি নিয়ে পৃথিবীতে আসে। তাকে দৈহিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলে উপযুক্ত নাগরিক করার দায়িত্ব পিতা-মাতার।
মহানবী (সাঃ) বলেছেন,

مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ.

‘প্রতিটি শিশুই ফিতরাতের (ইসলাম) ওপর জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খৃষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়’।

নিজ সন্তানদের জন্য নবীগণের দুআ-

সন্তান মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে মা-বাবার দুআর বড় ভূমিকা রয়েছে। এজন্য নবীগণ তাদের সন্তানদের জন্য দুআ করতেন। কুরআন মাজীদে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের একাধিক দুআর বিবরণ এসেছে। যেমনঃ

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّ اجْنُبْنِيْ وَ بَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ.

এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম (আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করেছিল আর তাতে) বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! এ নগরকে শান্তিপূর্ণ বানিয়ে দিন এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন। (সূরা ইবরাহীম - ১৪ : ৩৫)

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আরো দুআ করেন,

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ، رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَآءِ.

হে আমার প্রতিপালক! আমাকেও নামায কায়েমকারী বানিয়ে দিন এবং আমার আওলাদের মধ্য হতেও (এমন লোক সৃষ্টি করুন, যারা নামায কায়েম করবে)। হে আমার প্রতিপালক! এবং আমার দু'আ কবুল করে নিন। (সূরা ইবরাহীম - ১৪ : ৪০)

মারইয়াম রা. ভূমিষ্ঠ হলে তার ও তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তার মা দুআ করেছিলেন,

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ ... وَ اِنِّيْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، وَ اِنِّيْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ.

অতঃপর যখন তার কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করল তখন সে বলল,... আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম এবং তাকে ও তার বংশধরগণকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে হেফাজতের জন্য তোমার আশ্রয়ে অর্পণ করলাম। (সূরা আলে ইমরান - ৩ : ৩৬)

সন্তানের ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য পিতা-মাতা আল্লাহর কাছে দুআ-রোনাযারি করবে সন্তানের জন্মের আগ থেকেই, সন্তান কামনার সময় থেকেই। ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের জন্মের পূর্বে হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম তাঁর জন্য দুআ করেছিলেন।

আল্লাহ তাআলা ফরমান,

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ، قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً، اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ.

এ সময় যাকারিয়া স্বীয় প্রতিপালকের কাছে দু'আ করল। বলতে লাগল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তোমার নিকট হতে পবিত্র সন্তান দান কর। নিশ্চয়ই তুমি দুআ শ্রবণকারী। (সূরা আলে ইমরান - ৩ : ৩৮)

তিনি আরো দুআ করেন হে প্রভু! আপনি আমাকে একটি সন্তান দান করুন। এবং বলেন,

وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا.

হে রব! তাকে এমন বানান, যে (আপনার) সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত হবে। (সূরা মারইয়াম - ১৯ : ৬)

অর্থাৎ সন্তান ভূমিষ্ঠের পূর্বেই তিনি নেক সন্তান কামনা করে দুআ করেছেন।

হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের ভূমিষ্ঠের পূর্বে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দুআ করেছিলেন,

رَبِّ هَبْ لِیْ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ.

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমন পুত্র দান কর, যে হবে সৎলোকদের একজন। (সূরা আসসাফ্ফাত - ৩৭ : ১০০)

হযরত মারইয়াম রা.-এর জন্মের পূর্বে তার মা দুআ করেছিলেন,

رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ، اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ.

হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যে শিশু আছে, তাকে সকল কাজ থেকে মুক্ত রেখে তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম। সুতরাং তুমি আমার পক্ষ হতে তা কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি (সকল কিছু) শোন ও (সকল বিষয়ে) জান। (সূরা আলে ইমরান - ৩ : ৩৫)

সন্তানের জন্য নেক দুআ করা নেককার মুমিনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা তাঁর খাছ বান্দাদের একটি গুণ বর্ণনা করেছেন যে, তারা বলে,

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّیّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْیُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِیْنَ اِمَامًا.

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর, যারা হবে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর এবং আমাদেরকে কর মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য। (সূরা ফুরকান - ২৫ : ৭৪)

সুতরাং সন্তানের জন্য বেশি বেশি নেক দুআ করতে থাকা। তাদের উত্তম শিক্ষা-দীক্ষার জন্য আল্লাহর সাহায্য চাওয়া। কেননা তিনিই উত্তম সাহায্যকারী। আল্লাহর কাছে চাইতে থাকলে আল্লাহ অবশ্যই কবুল করবেন।

পিতা-মাতা উভয়ের নিকট আলাদাভাবে সন্তানের কিছু অধিকার স্বীকৃত। আমরা সন্তানের অধিকারকে দু'ভাগে বিভক্ত করতে পারি।

- **মাতার নিকট থেকে প্রাপ্ত অধিকার।**
- **পিতার নিকট থেকে প্রাপ্ত অধিকার।**

মাতার নিকট থেকে প্রাপ্ত অধিকার সমূহঃ

পৃথিবীতে একটি শিশুর আগমনে মায়ের যে ভূমিকা তা তো অতি স্পষ্ট। সন্তান গর্ভে ধারণ, সন্তান প্রসব, দুগ্ধদান ইত্যাদি সবগুলো পর্যায়ে মা একক ভূমিকা পালন করে। এ সময় একজন মাকে অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়। সাধারণ গৃহস্থালী কাজকর্মে পর্যন্ত অন্যের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই নাযুক মুহূর্তে মায়ের দায়িত্বও অনেক বেড়ে যায়। গর্ভস্থিত সন্তানের যথাযথ দৈহিক ও মানসিক গঠনের জন্য মাকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়। মায়ের এসময়ের চিন্তা-ভাবনা, কাজ-কর্ম ও আচরণের প্রভাব গর্ভের সন্তানের উপর পড়ে। সকল যুগের অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ এ সময় মাকে অতি সংযত জীবন যাপন করার পরামর্শ দিয়েছেন।

ইউরোপে বহু মানুষের আচার-আচরণ, মেজাজ-মর্জির উৎস সন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে মায়ের এসময়ের আচরণই এখানে নিয়ামকের ভূমিকা পালন করেছে। ফ্রান্সে এক সাদা দম্পতির কালো সন্তান জন্মগ্রহণ করলে চিকিৎসকগণ খুব আশ্চর্য হলেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সন্তান মাতৃগর্ভে থাকাকালীন মায়ের সম্মুখস্থ টেবিলে একটি কালো হাবশীর মূর্তি ছিল। মূর্তিটি মায়ের মনোযোগ আকর্ষণ করে তার চিন্তাভাবনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ফলে সন্তান পিতামাতার মতো না হয়ে সেই মূর্তির মতোই হয়েছে। (মুসলমান আওরাত, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ২১)

যখন সন্তান প্রসবের সময় আসে তখন মা মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। সন্তান প্রসবের পরও দীর্ঘদিন পর্যন্ত শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতার মধ্যে তার সময় কাটে। এ সময় তার প্রয়োজন হয় বিশেষ পরিচর্যার। সন্তানকে দুগ্ধদানের সময়টিও মা ও সন্তান উভয়ের জন্যই অতি গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর পরিচর্যার বিষয়টি তো আছেই এসময়ে মায়েরও বাড়তি যত্নের প্রয়োজন হয়। মাতৃদুগ্ধের মধ্য দিয়ে শিশু মায়ের অনেক কিছুই এ সময় গ্রহণ করে। এজন্য মাকে পূর্ণ সংযম ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

একটি সুন্দর শিল্পকর্ম দর্শককে আনন্দ দেয়। সবাই এর কারিগরের প্রশংসা করে। কেননা, এতে তার শিল্পী মনের আন্তরিকতার ছোঁয়া আছে, আছে সৃজনশীলতার স্পর্শ। কারিগর তার মনের মাধুরী মিশিয়ে সামান্য একটি মূল্যহীন মাটির টুকরোকে একটি মূল্যবান শিল্পকর্মে পরিণত করেছে। তার আন্তরিকতা, অধ্যবসায় আর অটুট মনোযোগের কারণে শিল্পকর্মটি সুন্দর ও মনোরম হয়েছে।

একজন সুন্দর ও পরিণত মানুষ নির্মাণের জন্য আরো অনেক বেশি যত্ন, আন্তরিকতা ও অধ্যাবসায়ের প্রয়োজন। পাশাপাশি পিতা-মাতার আচরণ, ঘরের পরিবেশ এসবও সন্তানের ব্যক্তিত্ব ও অভ্যাস গঠনে গভীর প্রভাব ফেলে। শিশু তার শৈশবে যেহেতু পুরোপুরি মায়ের সান্নিধ্যেই থাকে; তাই মায়ের আচার-আচরণ, ভাব-ভঙ্গি, ভাষা-অভ্যাস সব কিছুই শিশুরা

অনুকরণ করার চেষ্ট করে। একজন ভালো মা-ই সমাজকে একজন ভালো মানুষ উপহার দিতে পারেন।

এজন্য মায়ের দায়িত্ব অতি গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানকে ভালো ও পরিণত মানুষরূপে গড়ে তোলার জন্য যেমন মায়ের নিজের ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ অপরিহার্য, তেমনি সন্তানের জন্য একটি ভদ্র ও শালীন পরিবেশ নিশ্চিত করাও মায়ের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। ঘরের পরিবেশ যদি আল্লাহমুখিতার নূরে নুরান্বিত হয় নামায, তেলাওয়াত, তালীম, যিকির-আযকার, সুন্নতের পাবন্দী ইত্যাদিতে বরকতপূর্ণ হয় তবে তার প্রভাব শিশুর কচি মানসে না পড়ে পারে না। শিশুও তখন আল্লাহ-ভীরুতা আর ইবাদত-বন্দেগীর প্রেরণা নিয়েই বেড়ে উঠবে। ঘরের পরিবেশে যদি সত্যবাদিতা, সহনশীলতা, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, মায়া-মমতা, ভদ্রতা ও নম্রতার প্রকাশ থাকে তবে সবার অজান্তেই শিশু ওইসব মহৎ গুণাবলিতে সমৃদ্ধ হতে থাকবে। এজন্যই ইসলামী শরীয়তে পুরুষের প্রতি সন্তানের জন্য দ্বীনদার মা নির্বাচনের তাগিদপূর্ণ আদেশ করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহেচ্ছু 'নারীকে চারটি বৈশিষ্ট্যের কারণে বিবাহ করা হয়- সম্পদের কারণে, আভিজাত্যের কারণে, সৌন্দর্যের কারণে, আর দ্বীনদারীর কারণে, তবে তুমি যেন দ্বীনদার স্ত্রী লাভেই সমর্থ হও।' -সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম - মেশকাত ২৬৭

দ্বীনদার স্ত্রী লাভের প্রতি পুরুষকে উদ্বুদ্ধ করার মূল কারণ **দু'টি**;

প্রথমতঃ এতে পুরুষের জন্যও দ্বীনের পথে অগ্রগামী হওয়া সহজ হবে।

দ্বিতীয়তঃ দ্বীনদার মা থেকে দ্বীনদার সন্তান জন্মলাভ করবে।

দুটি ক্ষেত্র এমন রয়েছে, যেখানে নারীর অবদান সবচাইতে বেশি। ইসলাম এক্ষেত্রে নারীকে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এ দুই অঙ্গনে একজন নারী যে ভূমিকা রাখতে সক্ষম, অন্য কারো পক্ষে তা সম্ভব নয়। উম্মাহর আগামী প্রজন্মের কেবল অস্তিত্ব রক্ষায় নয়; তাদের চিন্তা-চেতনা, বোধ-বিশ্বাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং আদর্শ ও নৈতিকতার সুরক্ষায় মৌলিক অবদান রাখেন মায়েরা। এক্ষেত্রে তারা ভিত্তিমূলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। যুগে যুগে এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে এসেছেন তারাই। গুরুত্বপূর্ণ এ অধ্যায়টি তাদের সহায়তায় নয়; বরং মূল কর্মযজ্ঞটা তাদের হাত ধরেই হতে হয়। নতুবা মানবতা ও মনুষ্যত্বের ধারা (প্রকৃতপক্ষে যা উম্মাহর প্রকৃত মূল্য ও অবস্থান এবং তার অস্তিত্বের প্রয়োজন ও গুরুত্বের স্বাক্ষর বহন করে।) টিকে থাকতে পারে না।

এ **দু'টি** ক্ষেত্র হল-

এক। শিশুর দ্বীনী তালীম-তরবিয়ত এবং ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষার প্রথম পাঠটা তাকে রপ্ত করানো। তার দিল ও দেমাগে ঈমান ও ইসলাম খোদাই করে দেওয়া এবং দ্বীনী চেতনা ও মূল্যবোধ তার মাঝে প্রোথিত করে দেয়া।

দুই। ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের হেফাযত করা এবং বিজাতীয় কৃষ্টি-কালচারের ছোবল থেকে সন্তানকে রক্ষা করা।

কোনো অভ্যাস বা বিশ্বাস কিংবা কোনো ভালো-মন্দ অথবা যে কোনো বিষয় যদি কারো মন-মগজে বসে যায় তখন আমরা সেটাকে আমাদের ব্যবহারিক ভাষায় বলি 'য়ে চীয ঘুট্টি ম্যাঁ পড়ি হ্যয়'। অর্থাৎ অস্থি-মজ্জায় মিশে একাকার হয়ে যা স্বভাবে পরিণত হয় তাকেই বলা হয় 'ঘুট্টি ম্যাঁ ব্যঠ জানা'। তো একটি শিশু যখন অল্পস্বল্প বুঝতে আরম্ভ করে তখন তার 'ঘুট্টিতে' কী প্রোথিত হবে আর কী হবে না-এ দায়িত্বটা আঞ্জাম দিতে হয় মাকে এবং ঘরের অন্যান্য মুরব্বী মামী-চাচী, খালা-ফুফু ও দাদী-নানীদেরকে। ঘরোয়া পরিবেশে অনায়াসেই তারা তা আদায় করতে পারেন।

শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ এবং মনোবিজ্ঞানীগণ এ বিষয়ে জোর দিয়েই বলে থাকেন, শিশুর দিল-দেমাগের স্বচ্ছ শ্লেটে যে রেখাই টানো না কেন তা অঙ্কিত হয়ে যায়। আর বিলীন হয় না। অনেকসময় মনে হয়, হয়ত তা হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তা বিলকুল উধাও হয়ে যায় না। কোনো কারণে চাপা পড়তে পারে। কিন্তু সময় মতো তা আবার ফুটে ওঠে, জেগে ওঠে।

এভাবে চিন্তা করলে সন্তানের প্রতি মা ও ঘরের অন্যান্য নারীদের কর্তব্য অনেকাংশে বেড়ে যায়। তারা খুব সহজে শিশুর নির্মল অন্তরে পবিত্র আল্পনা আঁকতে পারেন। পরবর্তীতে কোনো শক্তি, কোনো চক্রান্ত, কোনো শিক্ষা, কোনো দীক্ষা, কোনো সভ্যতা, কোনো সংস্কৃতি, কোনো ধরনের কোনো কিছু খুব সহজে তা মুছে দিতে পারবে না। মিটিয়ে দিতে পারবে না।

মা ও শিশুর সেবা ও দেখভালে নিয়োজিত নারীগণ এবং ঘরের বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাগণ, পরিবারে যাদের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান রয়েছে, এতটুকুতেই আপনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না যে, বাচ্চাকে আল্লাহ-রাসূলের নাম শিখিয়ে দিলেন। কালিমা মুখস্থ করিয়ে দিলেন। নামাযের বয়স ঘনিয়ে এসেছে নামাযে অভ্যস্ত করলেন। কুরআন শরীফ শিখিয়ে দিলেন।

শিশুকে কালিমা, নামায, তিলাওয়াত শিখিয়ে দেওয়া, তাকে আল্লাহ-রাসূলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে এই কাজগুলোর পাশাপাশি শিশুকে এ তরবিয়তেও গড়ে তুলতে হবে, যাতে সে কুফর ও শিরক চিনতে পারে, এর অসারতা

অনুধাবন করতে পারে এবং এর প্রতি বিতৃষ্ণ মনোভাব নিয়ে বেড়ে উঠে। তাওহীদের বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা রাখে এবং এর প্রতি মহব্বত রাখে। মুসলিম পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে। ঈমান-ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারায় পুলক অনুভব করে। দ্বীনের ব্যাপারে আত্মমর্যাদাশীল হয়। আল্লাহর আনুগত্যে অটল-অবিচল থাকে। আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইশক ও মহব্বতে দিওয়ানা থাকে। গুনাহের প্রতি ঘৃণা বোধ করে। পার্থিব উৎকর্ষকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য মনে না করে এবং একেই চূড়ান্ত সফলতা জ্ঞান না করে। সততাপূর্ণ জীবন যাপন, সত্যবাদিতার অভ্যাস, পরোপকারিতা ও পরার্থপরতার আগ্রহ, সৃষ্টির সেবার মানসিকতা এবং দেশাত্মবোধ জাগ্রত করাও তাদের দায়িত্ব।

একটি শিশু এই দীক্ষা যদি ঘর থেকে লাভ করতে না পারে তাহলে বিশ্বের নামিদামি বিদ্যাপীঠ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বড় বড় প্রতিষ্ঠানও তাকে সেই সবক দিতে পারবে না। দিলেও কাঙ্খিত ফলাফল লাভ হবে না।

মুসলিম শিশুর অন্তরে কুফর-শিরক ও ইলহাদ এবং পৌত্তলিকতা ও নাস্তিকবাদের প্রতি-চাই তা বিজাতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসনে হোক কিংবা দেশীয় পুরাণ চর্চার মাধ্যমে, পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষাব্যবস্থার কারণে হোক অথবা প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে, কোনো লেকচার শুনে বা শিট পড়ে হোক অথবা কারো খপ্পরে পড়ে, দ্বীন সম্পর্কে বে-খবর থাকার কারণে হোক অথবা জাগতিক ফায়দা সিদ্ধির জন্যে, ইহবাদী সম্প্রদায়ের সংশ্রবে হোক কিংবা সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর কোনো প্রভাবে, যে সূত্রই এর উৎস হোক না কেন একজন মুসলিম শিশুর অন্তরে কুফর ও শিরকের প্রতি, নাস্তিকতা ও পৌত্তলিকতার প্রতি তীব্র ঘৃণা ও বিতৃষ্ণাবোধ জাগ্রত হতে হবে; যেমনটি হয়ে থাকে কোনো নাপাক ও দুর্গন্ধ বস্তুর ক্ষেত্রে। নতুবা তার ঈমান ও দ্বীনী মূল্যবোধের সুরক্ষা হবে না। তার ব্যাপারে একজন সহীহ আকীদাসম্পন্ন মুসলিম সত্তার জামানত দেওয়া যাবে না।

ভক্তি ও ঘৃণার এ অনুভূতি তাকে মুসলিম ঘর থেকেই জাগ্রত করতে হবে। এমন তরবিয়তেই তাকে গড়ে তুলতে হবে, যাতে ঈমান ও তাওহীদের প্রতি আকর্ষণ এবং শিরক-কুফর ও ইলহাদের প্রতি ঘৃণাবোধ তার অস্থি-মজ্জায় মিশে যায়। একটি মুসলিম পরিবারের ঐতিহ্য এতেই নিহিত। আর এভাবেই হতে পারে আগামী প্রজন্মের মনুষ্যত্ব ও মুসলমানিত্বের সুরক্ষা। শিশুর অন্তরে এ বিষয়গুলো গেঁথে দেওয়ার মূল ভূমিকা রয়েছে ঘরের মায়েদের। যদি মায়ের আঁচল থেকে শিশু এ দীক্ষা লাভ না করে তাহলে বিশাল বিশাল ওয়াজ মাহফিল, চমৎকার চমৎকার দ্বীনী কিতাব, বড় বড় উলামা-মাশায়েখের হাত ধরেও ব্যাপকভাবে তা হাছিল করা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়।

মায়ের নিকট হতে সন্তানের যে অধিকার স্বীকৃত তা **দু'টি** পর্যায়ে বিভক্ত।

(ক) গর্ভকালীন বা জন্মপূর্ব অধিকার।

(খ) জন্ম পরবর্তী অধিকার।

(ক) গর্ভকালীন অধিকার সমূহঃ

১। গর্ভধারণঃ

আল্লাহর অপার অনুগ্রহে গর্ভে আগত সন্তানকে মা অত্যন্ত আনন্দচিত্তে গ্রহণ করবেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বহন করবেন। এজন্য তিনি তার দেহ-মনকে সুস্থ, পূত-পবিত্র ও কলুষমুক্ত রাখবেন। সন্তানের মঙ্গলের নিমিত্তে নিজ স্বাস্থ্যের প্রতি সদা সতর্ক থাকবেন। সন্তানকে আপদ মনে করে বিনষ্ট করার চেষ্টা করবেন না। প্রয়োজনে নিজের সবটুকু বিলিয়ে দিবেন গর্ভস্থ সন্তানের জন্য এবং সাগ্রহে যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত থাকবেন। তবেই সন্তানের প্রতি মায়ের যথাযথ কর্তব্য পালন করা হবে।

মায়ের এ কঠিন দায়িত্ব সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে,

وَهْنٍ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى.

'তার মাতা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেছেন' *(লোকমান ৩১/১৪)*।

২। দৈহিক গঠনঃ

সন্তান গর্ভে অবস্থানকালীন সময়ে মায়ের কঠোর পরিশ্রম ও বেপরোয়া চলাফেরা তার দৈহিক গঠন প্রক্রিয়ার ওপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। সন্তানের কল্যাণের জন্য চলাফেরার সময় তাকে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন পূর্বক কঠোর পরিশ্রম হ'তে বিরত থাকতে হবে। অসাবধানতার কারণে সন্তান বিকলাঙ্গ হ'তে পারে, এমনকি গর্ভপাত পর্যন্তও ঘটতে পারে। এ সময় পুষ্টিকর ফলমূল এবং উত্তম খাদ্য মা গ্রহণ করবেন। ফলমূল অন্যান্য খাদ্যের তুলনায় বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে ফলমূলে অধিক পরিমাণে সুগার আছে যা সহজে হজম হয় এবং এ থেকে শরীর গ্রহণ করে জীবনী শক্তি ও খাদ্যপ্রাণ। ফলমূল দেহের ক্ষয়প্রাপ্ত শক্তি যোগাতে সাহায্য করে।

এ কারণে মহান আল্লাহ মারয়াম (আঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

وَهُزِّيْ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا -فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْناً.

'তোমার দিকে খেজুর বৃক্ষের কান্ডকে ঝুঁকিয়ে নাও, সে তোমার উপর পতিত করবে তাজা উপাদেয় খেজুর, তা তুমি খাও ও পান কর এবং নয়ন জুড়াও' *(মারয়াম ১৯/২৫-২৬)*।

আহার্য গ্রহণের ব্যাপারে নিয়মানুবর্তিতা মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য কল্যাণকর। সন্তানের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে রমাযানের ছিয়াম থেকে বিরত থাকার বিষয়ে শরী'আতের অনুমোদন আছে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَواةِ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ وَالْحُبْلَى.

'আল্লাহ তা'আলা মুসাফির হ'তে অর্ধেক ছালাত এবং মুসাফির, স্তন্যদানকারিনী মাতা ও গর্ভবতী স্ত্রী লোক হ'তে ছিয়াম উঠিয়ে নিয়েছেন'। অর্থাৎ ছিয়ামের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন।

৩। মানসিক গঠনঃ

দৈহিক কাজ-কর্মের ন্যায় এ সময় মায়ের মানসিক কর্মেরও প্রভাব সন্তানের উপর প্রতিফলিত হয়। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থাতেও নিজেকে সংযত রেখে ঝগড়া-বিবাদ ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতি হ'তে দূরে থাকা মায়ের অপরিহার্য কর্তব্য। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) থেকে বিমুখ করতে পারে এরূপ বই-পত্র ও ধ্যান-ধারণা হ'তে মনকে পূত-পবিত্র রাখতে হবে। কেননা যাবতীয় খারাপ, অশ্লীল চিন্তা-ভাবনা পরিহার করে সৎ চিন্তা ও কুরআন-হাদীছ এবং নবীদের জীবনী পঠন ও শ্রবণ গর্ভস্থ সন্তানের সুশীল মানসিকতা গঠনে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। হারাম এবং অবৈধ উপায়ে অর্জিত খাদ্যদ্রব্য গর্ভের শিশুর উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। তাই এসব হ'তে মাকে অনেক দূরে অবস্থান করতে হবে। হারাম বর্জন করে হালাল বস্তু খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে কুরআন মাজীদে এরশাদ হয়েছে,

وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَيِّبا.ً

'আল্লাহ তোমাদের যা কিছু রিযিক দান করেছেন, তার মধ্যে হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার কর' *(মায়েদাহ ৫৪/৮৮)*।

সন্তানকে সুষ্ঠ ও সুন্দর মনের একজন আদর্শবান মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার প্রধান দায়িত্ব মায়ের। মায়ের মন-মানসিকতার উপর নির্ভর করে সন্তানের মন-মানসিকতা। পৃথিবীর অধিকাংশ মা এ বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান না করার কারণে সন্তান হয় দুশ্চরিত্র। তাই একজন সুন্দর মনের সন্তান পেতে হ'লে মাকে সুন্দর পূত-পবিত্র মানসিকতাসম্পন্ন হতে হবে। গর্ভস্থ সন্তানের স্বার্থেই এটি প্রত্যেক মায়ের কর্তব্য এবং ভবিষ্যৎ সন্তানের এটি অধিকার। সন্তানের জন্য গর্ভবতী মাতার এসব মু'আমালাত অবশ্যই পালনীয়। এতে মাতা ও সন্তানের পার্থিব কল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং পরকালে মাতার জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান।

(খ) জন্ম পরবর্তী অধিকারঃ

১। মায়ের স্তনে সন্তানের অধিকারঃ

গাছের শাখা যেমন মূলের মুখাপেক্ষী, তেমনি শিশু জন্মের পর মায়ের উপর নির্ভরশীল। শিশুর জন্মের সাথে সাথে আল্লাহর রহমতে মাতৃস্তনে সৃষ্টি হয় শিশুর উপযোগী খাবার। সুতরাং পৃথিবীতে কোন মা যেন বিশেষ কারণ ছাড়া স্বীয় দুধপান থেকে সন্তানকে বঞ্চিত করে শিশুর অধিকার অস্বীকার না করেন।

সন্তানকে দুধপান করানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ প্রদান করে বলেছেন,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ.

'যে সকল জননী সন্তানদের পুরো সময় পর্যন্ত দুগ্ধ দান করতে ইচ্ছা রাখে, তারা নিজেদের শিশুদেরকে পুরো দু'বছর ধরে দুগ্ধ পান করাবে' *(বাক্বারাহ ২/২৩৩)*।

মায়ের বুকের দুধ শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানযুক্ত আল্লাহ প্রদত্ত এমন তৈরী খাবার, যা শিশু সহজেই হজম করতে পারে এবং তা শিশুর শরীরের বৃদ্ধি ঘটানোতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিশুর শরীরের খাদ্য চাহিদার যে পরিবর্তন ঘটে, মায়ের বুকের দুধে অনুরূপ পরিবর্তন প্রতিদিনই ঘটে থাকে। শিশুর দেহ যে পরিমাণ তাপমাত্রা হ'লে দুধ তার দেহে কাজে লাগতে পারে, সেরূপ তাপমাত্রা মায়ের বুকের দুধে বিদ্যমান থাকে। শিশুকে সুস্থ-সুন্দর করে গড়ে তুলতে হ'লে মায়ের বুকের দুধের বিকল্প নেই। মায়ের বুকের দুধে বেশ কিছু রোগ প্রতিরোধক উপাদান থাকে। যেমন- আই.জি.এ ল্যাকটোফেরিন এবং লাইসোজাইম। এছাড়াও মায়ের বুকের দুধে প্রচুর শ্বেত রক্তকণিকা থাকে যেগুলো আবার আই.জি.এ ল্যাকটোফেরিন, লাইসোজাইম, ইন্টারফেরন তৈরী করে। বাইফিজস ফ্যাকটর নামে আরও একটি পদার্থ মাতৃদুগ্ধে পাওয়া যায়। এগুলো সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করে। যার ফলে বাচ্চার দেহে ডায়রিয়া, কান পাকা রোগ, শ্বাসনালীর রোগ কম হয়। এছাড়া মাতৃদুগ্ধ পানে হৃৎপিন্ডের রোগ, করোনারী, খাদ্যনালীর রোগ প্রভৃতি প্রতিরোধ করে। মায়ের দুধ পান শিশুর চেহারার লাবণ্য সৃষ্টি করে, বাকশক্তি ও সাধারণ বুদ্ধি বিকাশে সাহায্য করে।

বিশেষ কারণ ছাড়া কোন মা শিশুকে দুধ পান হ'তে বঞ্চিত করে যে ক্ষতি সাধন করে, তা অপূরণীয়। কারণ স্তন্যদান মায়ের মধ্যে সৃষ্টি করে শিশুর প্রতি এক বিশেষ স্নেহ প্রবণতা ও আবেগ-অনুভূতি। যে সকল মহিলা তাদের চাকচিক্য ও রূপ-লাবণ্য নষ্ট হবার ভয়ে শিশুকে বুকের দুধ পান করানো হতে বিরত থাকে, তাদের এ হীন মানসিকতা এখুনি পরিত্যাগ করা উচিত।

শিশুর স্বাস্থ্য, মন-মানসিকতা, চরিত্র ও রুচি গঠনে মায়ের দুধের ভূমিকা যথেষ্ট। বিশেষ কারণ বশতঃ কোন শিশুকে আপন মা ব্যতীত অন্য মহিলার দুধ পান করানোর প্রয়োজন হয়ে পড়লে, সেক্ষেত্রে দুশ্চরিত্রা ও অসুস্থ মহিলার দুধ পান করানো হ'তে বিরত রাখতে হবে।

২। স্নেহের পরশে প্রতিপালনঃ

সন্তান মায়ের হৃদয়ের দরদ ও পরম স্নেহ-যত্নের দাবীদার। মা কোন প্রকার ঘৃণা না করে আন্তরিক ভালবাসা দিয়ে সন্তানের পরিচর্যা করবে। আদর-স্নেহ হ'তে বঞ্চিত সন্তানদের স্বভাব-চরিত্রে বিরূপ পড়ে থাকে। স্নেহের পরশে প্রতিপালনকারী মা আল্লাহর অনুগ্রহের অংশীদারিণী হয়ে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার হাসান বিন আলী (রাঃ)-কে স্বস্নেহে চুম্বন করেন। আকরা বিন হাবিস আত-তামিমী (রাঃ) এ দৃশ্য দেখে বললেন,

إِنَّ لِىْ مِنَ الْوَلَدِ عَشَرَةً مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا مِّنْهُم‘ .ْ

আমার দশটি সন্তান আছে, আমি তাদের কাউকেই কোন দিন চুম্বন করিনি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন,

إِنَّهُ مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرْحَم ْ

'যে দয়া করে না, তাকে দয়া করা হয় না'।

অন্য আরেকটি হাদীছে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَدِمَ نَاسٌ مِّنَ الْأَعْرَابِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوْا : أَتُقَبِّلُوْنَ صِبْيَانَكُمْ؟ قَالُوْا : نَعَمْ، فَقَالُوْا لَكِنَّا وَاللهِ! مَانُقَبِّلُ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْلِكُ أَنْ كَانَ اللهُ قَدْ نَزَعَ مِنْكُمُ الرَّحْمَةَ.َ

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদল বেদুঈন নবী করীম (সাঃ) এর নিকট এসে বলল, তোমরা কি তোমাদের সন্তানদেরকে চুমু দাও? উপস্থিত সবাই বলল, হ্যাঁ। তখন তারা বলল, কিন্তু আল্লাহর কসম! আমরা তাদেরকে চুমু দেই না। তখন নবী করীম (সাঃ) বললেন, 'আল্লাহ তোমাদের অন্তর থেকে মায়া-মমতা তুলে নিলে আমি কী করতে পারি'।

সন্তান জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে মায়ের নিকট অধিক সময় থাকে। তাই মায়ের অপত্য স্নেহের পরশ না পেলে সে নিজেকে অসহায় মনে করবে। মনরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, এ অসহায়ত্বের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এমন রূপ ধারণ করবে যা সারা জীবন খেসারত দিয়েও পরিশোধ করা যাবে না।

৩। পিতৃহারা সন্তানের প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগঃ

সন্তানকে সমাজ ও সংসার জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পিতা যেমনভাবে দায়িত্ব পালন করবেন, অনুরূপভাবে মাকেও তাতে অংশগ্রহণ করতে হবে। আর পিতা মারা গেলে মা-ই এ মহান দায়িত্ব পালনে সব রকম সহযোগিতা প্রদানে ব্রতী হবেন। স্বামীর মৃত্যুর পর চেহারা-সৌন্দর্য থাকা সত্ত্বেও অন্যের গৃহে না গিয়ে ইয়াতীম সন্তানদের প্রতিপালন ও প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে পারেন এমন মহিলা সত্যিই নারী জাতির গৌরব। এ গৌরব অর্জনের জন্য তাকে প্রতিটি পদে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।

৪। প্রাথমিক জ্ঞান দানঃ

শিশু জন্ম হতে বিদ্যালয়ে গমনের পূর্ব পর্যন্ত মায়ের সান্নিধ্যে লালিত-পালিত হয়। আর মায়ের কোল থেকেই শিশুর শিক্ষা তথা জ্ঞান আহরণের যাত্রা শুরু হয়। শিশুর মন এ সময় অত্যন্ত কোমল থাকে, সে জন্য তখন তাকে যে শিক্ষা দেয়া হয়, তা সে সহজে গ্রহণ করে। এ শিক্ষা তার ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় হিসাবে কাজ করে। তাই শিশুর মুখে আধো আধো বুলি ফুটতে শুরু করলে মাকে কথা বলার সময় অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। সন্তানের সামনে কটু বা খারাপ বাক্য উচ্চারণ করা হ'তে সংযত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করা প্রয়োজন। মায়ের মিষ্টিমিষ্টি কথা শিশুর অন্তরে প্রবলভাবে রেখাপাত করে। মা ইসলামের সুমহান শিক্ষার কথা সুমধুর ভাষায় শিশুর মাঝে ছড়িয়ে দিবেন। তাকে ইসলামের প্রাথমিক বিষয়সমূহ শিক্ষা দিবেন। অধিক ভোজনের অপকারিতা, জোরে চীৎকার করে কথা না বলা সম্পর্কে জ্ঞান দান করবেন। দুষ্টু প্রকৃতির ছেলে-মেয়েদের সাথে মিশতে, মিথ্যা ও অহেতুক কথা বলার মত অশালীন কাজ থেকে তাদেরকে বিরত রাখবেন। নিজেদের কাজ যথাসম্ভব নিজ হাতে করার অভ্যাস গড়ে তুলতে শিক্ষা দিবেন। ভাল কাজ করলে ধন্যবাদ প্রদান এবং মন্দ কাজ করলে মৃদু শাসন করতে হবে।

শিশু একটি পুষ্পকলি। মা তার মধ্যে মানবীয় গুণাবলী, সুন্দর চরিত্রের রং, রূপ ও গন্ধ ভরে দিবেন। মায়ের অভিপ্রেত অনুযায়ী সুষ্ঠুভাবে শিশুর শিক্ষা হলে বৃহত্তর সমাজ ও জাতি নিঃসন্দেহে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

৫। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনে অভ্যস্ত করাঃ

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সৌন্দর্যের মূল ভিত্তি। কোন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত তার শরীরকে পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করার ব্যাপারে সচেষ্ট না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ইসলামের মানদন্ডে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত এবং সর্বদিকে সম্মানিত ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে না। আর যতক্ষণ পর্যন্ত পানাহার ও পোষাক-পরিচ্ছদের বেলায় সকল প্রকার ময়লা ও অপরিচ্ছন্নতা থেকে দূরে

থাকতে পারবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে না। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি মা তার ছোট্টমণিকে শিশুকাল থেকে শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে সচেষ্ট হবেন। শরীরের রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকার নিমিত্তে কাপড়-চোপড় পরিচ্ছন্ন, খাদ্যদ্রব্য পবিত্র রাখা এবং খাদ্যের পাত্র পরিষ্কার করা একান্ত দরকার। এ ব্যাপারে মা সন্তানকে অভ্যস্ত করে তুলবেন। কারণ পবিত্রতা আল্লাহর নৈকট্য লাভে সহায়তা দান করে।
এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদে এরশাদ হয়েছে,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ۔

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকেও ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*।
যেমনিভাবে নিজের শরীর ও মনকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, তেমনিভাবে ঘর-দরজা, বাড়ীর চারপাশের পরিবেশ, রাস্তা-ঘাট, পরিষ্কার রাখতে হবে। একথা মা তার সন্তানকে শৈশব থেকে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে এ ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলবেন।
রাসূল (সাঃ) এ সম্পর্কে বলেন,

نَظِّفُوْا أَفْنِيَتَكُم.ْ

'তোমরা তোমাদের বাড়ির আঙ্গিনা ও সম্মুখ ভাগ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখ'।
শৈশবে শিশুর মন অত্যন্ত পবিত্র এবং নরম থাকে। নরম মাটিকে কুমার যা ইচ্ছা তা করতে পারে। অনুরূপভাবে মা পবিত্র নরম হৃদয়ের শিশুটিকে পবিত্রতা তথা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে যেরূপ প্রশিক্ষণ দান করবেন, সেভাবে জীবনের বাকী দিনগুলি সে অতিবাহিত করবে।

৬। সৌজন্যবোধ শিক্ষা দানঃ

শিশু-সন্তান মাকে বেশী অনুসরণ করে। তাই মা শৈশবেই শিশুকে সৌজন্যবোধ শিক্ষা দিবে। যাতে করে শিশু প্রশংসনীয় কাজ ও সুন্দর চরিত্রে সজ্জিত হয়ে বড় হ'তে পারে। সন্তান যেহেতু বিশ্ব প্রকৃতির পবিত্র উপাদান এবং সমাজরূপী প্রাসাদের ইট সমতুল্য, সেহেতু সন্তানকে ভদ্রতা, বিনয়, সরলতা, সততা, সত্যবাদিতা ইত্যাদি গুণাবলী শিক্ষা দানে মাতা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন। একজন শিশু পরবর্তী জীবনে পৃথিবীর সকলের নিকট এক আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠার জন্যই মায়ের নিকট হ'তে সে এই গুণাবলী অর্জনের অধিক হকদার।

৭। উন্নত মন-মানসিকতা গঠনঃ

মানুষ আল্লাহর খলীফা। আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালন করাই মানুষের প্রকৃত দায়িত্ব ও কর্তব্য। প্রতিটি মানুষের উপর একদিকে রয়েছে স্রষ্টার অধিকার, আর অপর দিকে রয়েছে অগণিত সৃষ্টির অধিকার। স্রষ্টা এবং সৃষ্টির অধিকার সুন্দররূপে আদায়ের জন্য সন্তানের উন্নত মন-মানসিকতা গঠন করার ব্যাপারে মাকে সচেষ্ট হ'তে হবে। শিশুর মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি জাগ্রত করতে হবে। তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে আল্লাহর অধিকার পূর্ণরূপে আদায় করলে পরকালে চির সুখের স্থান জান্নাত পাওয়া যাবে। আর তা আদায় না করলে চরম শাস্তির সম্মুখীন হ'তে হবে। সৃষ্টির প্রতি অধিকার বলতে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন তথা বিশ্বের সকল সৃষ্টজীবের সাথে উত্তম আচরণ করলে ইহজীবনে শান্তি ও পরজীবনে পুরষ্কার লাভে সক্ষম হবে, একথা তাদের মনের মধ্যে গ্রোথিত করে দিতে হবে। এছাড়াও অপসংস্কৃতির সয়লাব থেকে বেঁচে থাকার জন্য তাদেরকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে। তাদের মধ্যে বীরত্ব, দৃঢ়তা সৃষ্টি করা এবং ভীরুতা-কাপুরুষতা পরিহারের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। বৈধ সীমানার মধ্যে অবস্থান করে নিজের আত্মসম্মানবোধ ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দিতে হবে। অপরপক্ষে অন্যের সম্মান যেন বিনষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মোটকথা তাদেরকে পরিকল্পিত জীবন-যাপনে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে, যাতে করে তারা নিজেদেরকে বিশ্ববাসীর সামনে এক উত্তম উদাহরণ হিসাবে পেশ করতে সক্ষম হয়।

৮। ব্যবহারিক শিক্ষা দানঃ

দৈনন্দিন জীবনে এমন অনেক কাজ রয়েছে, যা একজন মানুষ জীবনের ঊষালগ্ন হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হলে বড় হয়ে তা পালনে ব্যর্থ হয়। নিজের ব্যবহৃত কাপড়-চোপড় গোছানো, ঘর-দুয়ার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, অযূ-গোসল করে পাক-ছাফ হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে সন্তানকে শিক্ষা দিতে হবে। বিশেষ করে মেয়ে সন্তানকে গৃহস্থালী কাজ-কর্মে অভ্যস্ত করে তোলা, রান্না-বান্না ও অন্যান্য কাজের শিক্ষা দিয়ে দক্ষ ও সুনিপুণ করে গড়ে তুলতে হবে। যাতে ভবিষ্যতে তারা আদর্শ গৃহিনী হতে পারে। মানুষের চলার পথে ব্যবহারিক জীবনের কাজগুলি শিক্ষা দিয়ে সন্তানকে ভবিষ্যৎ জীবনের সোপান তৈরী করে দিতে মা একটি উত্তম প্রতিষ্ঠান। একথা স্মরণ রেখে প্রত্যেক মায়ের স্বীয় দায়িত্ব পালন করাই সন্তানের অধিকার।

৯। তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়াঃ

সন্তানের তত্ত্বাবধান করা একজন আদর্শ মায়ের বড় কর্তব্য। সন্তানকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সৎ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই মাকে তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। সন্তানকে উত্তমরূপে গড়ে তোলার ব্যাপারে মাকেই মমতাময়ীর ভূমিকা পালন করতে হবে। ইসলাম মাকে গৃহের দায়িত্বশীলরূপে স্থির করেছে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন,

'প্রত্যেক আদম সন্তান কর্তা। পুরুষ তার পরিবারের কর্তা আর নারী তার ঘরের কর্ত্রী'।

হাদীছে এসেছে,

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُم.ْ

'স্ত্রীরা নিজের স্বামীর ঘর ও তার সন্তানের রক্ষক, সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।

সন্তানের প্রতিটি ক্ষেত্রে মা উত্তম পরিচালক হিসাবে পরিচয় দিতে না পারলে শিশুর উপরে উঠার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। চালক একটু অমনোযোগী হবার কারণে যেমনভাবে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটে, তেমনভাবে মা তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে সামান্যতম বেখেয়াল হ'লে সন্তানের জীবনের সোনালী সূর্য অস্তমিত হয়ে কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। অতএব এ বিষয়ে আমাদের আরো সচেতন হতে হবে।

(খ) পিতার নিকট থেকে প্রাপ্ত অধিকারসমূহঃ

সন্তানের প্রতি পিতার দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন এবং দীর্ঘমেয়াদী। মাতৃগর্ভে সন্তানের সঞ্চারণ শুরু হবার সময় হতে বড় হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর দায়িত্ব অব্যাহত থাকে। এজন্য ইসলাম দাম্পত্য জীবনের ব্যয়ভার বহন ও দৈহিকভাবে সক্ষম ব্যক্তিকেই বিবাহ করার অনুমতি প্রদান করেছে। পিতার নিকট হতে প্রাপ্ত সন্তানের অধিকারগুলোকে আমরা দুই পর্যায়ে বিভক্ত করতে পারি।

- **সন্তানের পৃথিবীতে আগমনের পূর্ববর্তী অধিকার।**
- **সন্তানের পৃথিবীতে আগমনের পরবর্তী অধিকার।**

সন্তানের পৃথিবীতে আগমনের পূর্ববর্তী অধিকার সমূহ

১. সন্তানের জন্য পুণ্যবতী মায়ের ব্যবস্থাকরণঃ

ইসলাম শুধু যে জন্মের পর থেকেই শিশুদের প্রতি গুরুত্ব দেয় তা নয়; বরং সন্তান তার পিতার ঔরসে বা মায়ের গর্ভে তার আকৃতি সৃষ্টি হবার পূর্ব থেকেই তার প্রতি গুরুত্বারোপ

প্রদান করেছে। পুরুষদের প্রতি বিবাহ সম্পর্কে ইসলাম নির্দেশ প্রদান করেছে যে, প্রস্তাবিত মহিলা যেন আল্লাহভীরু হয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিবাহের ক্ষেত্রে বংশ, সম্পদ, সৌন্দর্য ও আল্লাহভীরুতার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

যেমন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

'মহিলাদেরকে **চারটি** গুণের অধিকারিণী দেখে বিবাহ করা হয়।

(ক) তার ধন-সম্পদ

(খ) বংশমর্যাদা

(গ) তার সৌন্দর্য ও

(ঘ) তার ধর্মপরায়ণতা।

তোমরা দ্বীনদার মহিলাকে বিয়ে করে ধন্য হও, অন্যথা তোমার উভয় হাত ধুলায় ধূসরিত হবে'। (অর্থাৎ তুমি লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে)।

বিবাহ করার সময় মহিলার রূপ বা সম্পদই যেন সবকিছু বলে বিবেচিত না হয়; বরং এর যে কোন একটির সাথে ধর্মপরায়ণতার গুণটি অবশ্যই যুক্ত হতে হবে। মহিলা যেন ভদ্র পরিবারের সদস্যা হন। কারণ তার সন্তানেরা তার চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

ওমর (রাঃ) জনৈক পুত্র কর্তৃক সন্তানের প্রতি পিতার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে উত্তরে বলেছিলেন, 'পিতার দায়িত্ব হচ্ছে, তিনি যেন সন্তানের মাতা নির্বাচনে ভুল না করেন'।ভাল সন্তানের জন্যে সতী-সাধ্বী মা হওয়া শর্ত। আর এ শর্তটি পিতা পূরণ করে সন্তানের হক আদায়ে সচেষ্ট হবেন।

২. গর্ভবতী মায়ের পুষ্টি, সুস্থতা ও সেবাযত্নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণঃ

শিশু সুস্থ ও শক্তি-সামর্থ্যবান হওয়া প্রতিটি পরিবারের কাম্য। এজন্য গর্ভবতী মায়ের প্রয়োজনীয় খাদ্যের যোগান এবং অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে পিতাকে। গর্ভবতী মায়ের প্রতি পিতার যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্যই গর্ভস্থ সন্তানের অধিকার। এই দায়িত্ব পিতা নিষ্ঠার সাথে পালন করলে সম্পূর্ণ সুস্থভাবে শিশু জন্মলাভ করার যথার্থ অবস্থা ও পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

সাধারণ অবস্থার চেয়ে গর্ভকালীন সময়ে মায়ের পুষ্টিকর খাদ্যের বেশী প্রয়োজন হয়। মা সুস্থ সবল না থাকলে, সুস্থ সবল সন্তান জন্ম দিতে পারে না। কাজেই যে সমস্ত খাদ্যে বেশী পরিমাণ ভিটামিন রয়েছে, সেরূপ খাদ্য সরবরাহ করতে পিতা সদা সচেষ্ট থাকবেন।

মায়ের দৈহিক পরিশ্রম লাঘবের জন্যে পিতাকে গৃহস্থালী কাজে সহায়তা করতে হবে। সন্তানের মঙ্গলার্থেই গর্ভধারিণী মাতার স্বাস্থ্য রক্ষা, সুস্থ দেহ, মন-মানসিকতা গঠন ও পবিত্র রাখা এবং হালাল খাদ্যের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা পিতার দায়িত্ব। সর্বোপরি সর্বাঙ্গীন সুন্দর সন্তান প্রাপ্তির আশায় মাকে পুষ্টিকর উপাদেয় খাবার যোগান দেওয়া, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে থাকার ব্যবস্থা করা এবং ইসলামী ভাবধারা সম্বলিত পুস্তকাদি সরবরাহ করা পিতার কর্তব্য। একজন অনাগত সন্তান সুস্থ ও সুন্দরভাবে পৃথিবীতে আসার জন্য এ সমস্ত বিষয় একজন আদর্শ পিতার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

পৃথিবীতে আগমনের পরবর্তী অধিকার সমূহঃ

শিশুরা হচ্ছে জীবনের কিশলয়, আশার ফসল, মানুষের চোখ জুড়ানো ধন, উম্মাহর প্রস্ফূটিত ফুল, মানবতার ভবিষ্যত, সত্যিকার প্রভাতের উদয়, ঝলমলে আগামী দিন, গৌরবময় অতীতের প্রত্যাবর্তন এবং উম্মাহর কীর্তিমান মর্যাদার শাসন সংরক্ষিত রাখার একটি মাধ্যম। সন্তান মানুষের ইপ্সিত আশার প্রতীক। তাই সন্তান জন্মগ্রহণ করার পরেই কতগুলি মৌলিক দায়িত্ব পিতাকে পালন করতে হয়। এই গুরু দায়িত্ব হতে অমনোযোগী হলে তাকে পরকালে জবাবদিহি করতে হবে।

সন্তানকে যথাযথভাবে প্রতিপালন করা ও তাদের নৈতিকতার উন্নয়নে পিতা যত্নবান না হলে অথবা অর্পিত দায়িত্ব পালন না করলে সন্তানের ভবিষ্যৎ হয়ে উঠে দুর্বিসহ। কাজেই একজন পিতা সন্তানের সঙ্গে বৈরী মনোভাব পরিহার করে বন্ধুসুলভ আচরণ করবেন। সর্বদা সন্তানের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করবেন, আদর ও স্নেহ করবেন এবং প্রয়োজনে নছীহত করবেন।

১. একত্ববাদের আহবান শুনানোঃ

শিশু মায়ের গর্ভ হতে পৃথিবীতে আগমনের পরক্ষণেই তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে কানে আযান দিতে হয়। আবু রাফে‘ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দেখেছি যে, ফাতিমা (রাঃ)-এর গর্ভ থেকে হাসান (রাঃ)-এর জন্ম হ’লে রাসূল (সাঃ) তাঁর কানে ছালাতের আযানের মত আযান দিয়েছিলেন।

একজন শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার মন থাকে সম্পূর্ণরূপে পূতপবিত্র ও নিষ্পাপ। সে সময় তাকে সর্বপ্রথম যে বাক্য শুনানো হবে, সেটাই হবে তার সারাজীবনের চলার পাথেয়। ইসলাম স্বভাবজাত আদর্শ। এ আদর্শের বাণী তার কর্ণকুহুরে প্রবেশ করলে, সে নিজেকে এ পথের অনুসারী বানাবার প্রয়াস চালাবে সারাটি জীবন।

কুরআন মাজীদে এরশাদ হয়েছে,

فِطْرَةَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ-

‘এ হচ্ছে আল্লাহর ঐ ফিৎরাত (প্রকৃতিজাত আদর্শ) যার উপর সমস্ত মানবগোষ্ঠীকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সঠিক-সুন্দর দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না’ *(রূম ৩০)*।

মা এ সময় অবচেতন অবস্থায় থাকেন, তাই এ ব্যাপারে বাবাকে ভূমিকা পালন করতে হবে। আর আল্লাহর বান্দা হিসাবে পৃথিবীর আলোয় পা রেখে প্রথম আল্লাহর একত্ববাদের কথা পিতার নিকট থেকে শুনবে এটি তার শাশ্বত অধিকার।

২. তাহনীক করাঃ

খেজুর চিবিয়ে সেই চর্বিত খেজুর নবজাতকের মুখে দেয়াকে তাহনীক বলে।

وআবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ُلِدَ لِىْ غُلاَمٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيْمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَرَفَعَهُ إِلَى .َّ

'আমার একটি শিশু সন্তান জন্মগ্রহণ করলে আমি তাকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে পেশ করলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহীম আর খেজুর দ্বারা তার তাহনীক করলেন এবং তার জন্য বরকতের দো'আ করে তাকে আমার নিকট ফিরিয়ে দিলেন'।

৩. সুন্দর নাম রাখাঃ

নামের মধ্যেও মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে। আর মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়েও ব্যাপক প্রভাব পড়ে। ভাল নামের বদৌলতে সন্তানের অনাগত দিনগুলো হ'তে পারে সুন্দর ও মঙ্গলময়। তাই পিতার কর্তব্য হলো সন্তানের সুন্দর ও অর্থবহ নাম রাখা। ইসলামের দেয়া পবিত্র দায়িত্ব হিসাবে পিতা পুত্রের উত্তম নাম রাখবেন। অর্থহীন ও সুন্দর নয় এমন নাম রাখলে এর প্রভাব শুধু তার উপরেই নয়; বরং পরবর্তী বংশধরদের উপরেও পড়ে।

ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁর পিতা নবী (সাঃ)-এর নিকট আসলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? তিনি বললেন, 'হাযন (কর্কশ)। নবী করীম (সাঃ) বললেন, বরং তোমার নাম 'সাহ্ল' (নম্র)। তিনি বললেন, أَنَا مَا سَمَّانِيْهِ أَبِى بِمُغَيِّرٍ إِسْمًا. 'আমার পিতা আমার যে নাম রেখেছেন, তা অন্য কোন নাম দিয়ে বদলাব না'। ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ) বলেন

فَمَا زَالَتْ فِيْنَا الْحُزُوْنَةُ بَعْدُ. ',

এরপর থেকে আমাদের বংশে চিরকাল রুক্ষতা বিদ্যমান ছিল'।

অর্থহীন ও মন্দ নাম রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পরিবর্তন করে মাধুর্য ও শ্রুতিপূর্ণ নাম রাখতেন। হাদীছে বর্ণিত আছে,

إِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغَيِّرُ الْإِسْمَ الْقَبِيْحَ .َ

'নবী করীম (সাঃ) খারাপ নাম পরিবর্তন করে দিতেন'।রাসূল (সাঃ) জনৈক ছাহাবীর নাম পরিবর্তন করে মুনযির রেখেছিলেন। তাছাড়া তিনি (সাঃ) 'আছিয়া' নাম্নী এক মহিলার নাম পরিবর্তন করে 'জামীলা' এবং 'বার্রাহ'-এর নাম পরিবর্তন করে 'যায়নাব' রেখেছিলেন। আল্লাহ তা'আলার বহু গুণবাচক নাম আছে, ঐ সমস্ত নামের সাথে 'আবদ' শব্দ যোগ করে নাম রাখা উত্তম।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ: عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ

‘আল্লাহর নিকট তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় নাম আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান’।

শিশু জন্মগ্রহণ করার পর পরই শিশুর নাম রাখা যায়। তবে সবচেয়ে উত্তম হ’ল শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে নাম রাখা।

৪. আকীকাঃ

নবজাত শিশুর মাথার চুল অথবা সপ্তম দিনে নবজাতকের চুল ফেলার সময় যবেহকৃত বকরীকে আক্বীক্বা বলা হয়। শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে আক্বীক্বা করা উত্তম।

এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, ‘প্রতিটি শিশু তার আক্বীক্বার সাথে বন্ধক থাকে। অতএব তার জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু যবেহ করবে, মাথার চুল মুন্ডন করবে এবং নাম রাখবে’।

নবজাতক পুত্র সন্তান হ’লে দু’টি ছাগল এবং কন্যা হ’লে একটি ছাগল আক্বীক্বা হিসাবে প্রদান করতে হবে। উম্মে কুরয্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ‘সন্তান ছেলে হ’লে দু’টি ছাগল আর মেয়ে হ’লে একটি ছাগল আক্বীক্বা করবে’। তবে পুত্র সন্তানের জন্য একটি ছাগলও আক্বীক্বা করা যায়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-এর জন্য একটি করে ছাগল আক্বীক্বা করেছিলেন।

৫. খাৎনাঃ

সন্তানের পিতার নিকট আরো কটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো, তিনি যথাসময়ে তার খাৎনা করাবেন। পুত্র সন্তানের পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের বাড়তি চামড়া কেটে ফেলাকে খাৎনা বলে। খাৎনা করা একটি উত্তম পন্থা ও ইসলামের বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত কাজ।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, ‘স্বভাব সম্মত কাজ পাঁচটি। তার মধ্যে খাৎনা করা একটি’। আধুনিক বিজ্ঞানেও খাৎনার উপকারিতা স্বীকৃত।

৬. জীবনের নিরাপত্তা ও বিকাশ সাধনে লালন পালন করাঃ

পিতা হৃদয় নিংড়ানো ঐকান্তিক দরদ, ভালবাসা ও স্নেহ-মমতার কোমল পরশে সন্তানকে লালন-পালন করবেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘তাদের (সন্তান ও জননীর) ভরণ-পোষণের ভার পিতার উপরই ন্যস্ত’ *(বাক্বারাহ ২/২৩৩)*। পিতার নিকট হ’তে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় মৌলিক উপকরণ সন্তানের প্রাপ্য অধিকার। সন্তানের এ সমস্ত প্রয়োজন পূরণে পিতা অমনোযোগী হ’লে অবশ্যই তাকে জবাবদিহি করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

‘তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই আপন আপন দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে’।

সন্তানের জীবনের নিরাপত্তা, চিকিৎসা, রোগমুক্ত রাখা, স্বাস্থ্যবান রূপে গড়ে তোলা এবং জীবনের উন্নতি ও বিকাশকল্পে পিতাকে যথোপযুক্ত দায়িত্ব পালন করতে হবে।

শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধনে খাদ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। জন্ম হবার পর সাধারণতঃ প্রথম ৪ থেকে ৬ মাস পর্যন্ত শিশুরা মায়ের বুকের দুধের উপর নির্ভরশীল থাকে। এ সময় পিতাকে মায়ের খাদ্যের প্রতি সুদৃষ্টি দিতে হবে। ছয় মাস পার হ’লে মায়ের দুধের পাশাপাশি শিশুর উপযোগী অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করবেন। এভাবে বয়স বাড়ার সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে খিচুড়ি, ভাত, রুটি ও অন্যান্য খাদ্যের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় যেন টাটকা শাক-সবজি থাকে সেদিকেও পিতাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। এছাড়াও আয়োডিনযুক্ত লবণ ও বিশুদ্ধ পানির যোগান দিতে হবে। এতে খাদ্যের মৌলিক ছয়টি গুণ সংগৃহীত হবে। আর এর দ্বারা শরীরের গঠন ও ক্ষয়পূরণ নিশ্চিত হবার সাথে সাথে রোগ-ব্যাধির প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে।

হাদীছে নিজ পরিবারের জন্য ছওয়াবের আশায় ব্যয় করার ফলস্বরূপ একটি ‘ছাদাক্বা’ রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে’।

অন্য হাদীছে রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

أَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِه .ِ

‘সর্বোত্তম ব্যয় হচ্ছে ঐ অর্থ (দিনার) যা কোন ব্যক্তি ব্যয় করে নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য’

পৃথিবীর প্রতিটি গৃহে প্রত্যেক ব্যক্তি সন্তান কামনা করে। সন্তানের উপস্থিতি যেমন কল্যাণ বয়ে আনে, তেমনি গৃহের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করে। তাই যে গৃহে নিষ্পাপ শিশুর কল-কাকলি থাকে না, সে গৃহের শোভা ও সৌন্দর্য অনেকটাই ম্লান হয়ে যায়।

৭. আদব-কায়দা শিক্ষা দানঃ

আজকের শিশু আগামী দিনে সুস্থ পরিবার, সুন্দর সমাজ ও জাতি গঠনের মৌলিক স্তম্ভ। শিশুর মন অত্যন্ত কোমল। এ সময় তাকে সুশিক্ষা দিলে ভবিষ্যত জীবনে তা তার পাথেয় হিসাবে কাজ করবে। সেজন্য তার চরিত্র, মন-মানসিকতা, মানবিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে ইসলামের উন্নততর আদর্শ ও নীতিমালার রং-রূপ-গন্ধে ভরে দেয়া পিতার অবশ্য করণীয়। সততা, পরোপকারিতা, পরমতসহিষ্ণুতা, দানশীলতা, জীবে দয়া, বড়দের সম্মান, ছোটদের স্নেহ ইত্যাদি সৎগুণাবলী শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে। অপরপক্ষে অহংকার, মিথ্যা, ধোঁকাবাজী, গীবত, চোগলখোরী, মূর্খতা, উদাসীনতা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, কারো প্রতি

হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা ইত্যাদির প্রতি তাদের হৃদয়ে ঘৃণা সৃষ্টি করতে হবে।
পিতাকে শিশুর আচার-আচরণের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে, যেন সে বিকৃত স্বভাব, অপসংস্কৃতি ও কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে বিপথে পরিচালিত না হয়। বৃহত্তর বিশ্বের চলমান চাকা তলে পিষ্ট হয়ে তার ব্যক্তিত্ব যেন গোড়াতেই বিধ্বস্ত না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

৮. ইসলামের অনুশাসনে জ্ঞান দান ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনে অভ্যস্ত করাঃ

প্রতিটি শিশু ফিতরাত তথা ইসলাম গ্রহণের যোগ্যতা সহ জন্মগ্রহণ করে। সুন্দর চরিত্রে চরিত্রবান হবার যোগ্যতা প্রতিটি শিশুর মধ্যেই বিদ্যমান আছে; যদি পিতা এ ব্যাপারে যত্নবান হন এবং পরিবেশ অনুকূলে থাকে। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আসমান-যমীন সব কিছুতেই আল্লাহর অস্তিত্ব বিদ্যমান এ ধারণাটি শিশুদের মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে দিতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে এক আল্লাহর উপর ঈমান আনা, অতঃপর রাসূল, ফেরেশতা, কুরআন মাজীদ সহ অন্যান্য ইলাহী গ্রন্থ সমূহ, কবর, হাশর-নশর, আখেরাত ইত্যাদির উপর ঈমান আনয়নের ব্যাপারে শিক্ষা দিতে হবে। শিরক ও বিদ'আতের অকল্যাণ ও ভয়াবহতার কথা তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে।
পিতা শিশুকে লোকমান (আঃ)-এর ছেলেকে প্রদত্ত নছীহতের অনুসরণে উপদেশ প্রদান করবেন এবং তা যথাযথভাবে মেনে চলার জন্য উৎসাহ প্রদান করবেন।
লোকমান স্বীয় সন্তানকে বলেছিলেন,
'হে বৎস! আল্লাহর সাথে শিরক কর না। নিশ্চয়ই শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় যুলুম'। 'হে বৎস! কোন বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা ভুগর্ভে, তবে আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত। 'হে বৎস! ছালাত প্রতিষ্ঠা করবে। সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করবে। এটাই দৃঢ় সংকল্পের কাজ। অহংকারবশতঃ তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করবে না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে চলাফেরা করবে না। কারণ আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। তুমি চলাফেরা করবে সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু করবে। নিশ্চয়ই গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর' *(লোকমান ৩১/১৬-১৯)*।
ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে একজন শিশুকে আদর্শ মানুষের মূর্তপ্রতীক হিসাবে বিশ্বদরবারে পেশ করার জন্য লোকমান (আঃ)-এর উপদেশ 'ম্যাগনাকার্টা' হিসাবে গৃহীত। এই মডেল

তৈরী করার জন্য পিতাকে যত্নবান হওয়া অবশ্যই দরকার।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِسِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ .

'তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাত বৎসর বয়সে ছালাত আদায়ের জন্য আদেশ করবে এবং দশ বৎসর বয়সে ছালাত আদায় না করলে প্রহার করবে, আর তাদের শয্যা পৃথক করে দিবে'।

সন্তানকে জীবনের ঊষালগ্ন হ'তে বিলাসিতা ও অলসপ্রবণ করে গড়ে তুললে তার ভবিষ্যত হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়বে। তাই সন্তানকে কষ্টসহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল এবং পরিস্থিতির মোকাবিলা করার উপযুক্ত হিসাবে গড়ে তোলা পিতার দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পুরোপুরিভাবে পালন করলেই সন্তান যেন তার অধিকার পিতার নিকট থেকে বুঝে পেল।

৯. সমতা বিধান করাঃ

পুত্র-কন্যা পিতার নিকট সবাই সমান। তাই সন্তানের মধ্যে আচরণে সমতা বিধান করে পিতাকে অবশ্যই চলতে হবে। সাম্য, ন্যায় ও ইনছাফের পথ থেকে ফিরে যাওয়া সহজ-সরল পথ থেকে ফিরে যাওয়ার নামান্তর। ইসলাম সন্তানদের মধ্যে সাম্য বিধানের জোরালো নির্দেশ দিয়েছে। অন্যসব সন্তানদের বাদ দিয়ে নির্দিষ্ট একজন সন্তানের প্রতি ঝুঁকে পড়া বা কন্যা সন্তানদের বাদ দিয়ে পুত্র সন্তানদেরকে প্রাধান্য দেয়া সম্পূর্ণরূপে ইনছাফ পরিপন্থী। ইসলাম ছেলে-মেয়ের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করার অনুমতি প্রদান করে না। তারা উভয়ে যেন একই মানদন্ডের দুই প্রান্ত।

পিতা-মাতার উপর সকল সন্তানের এ অধিকার স্বীকৃত যে, তারা দান ও ব্যয়ের ব্যাপারে সন্তানদের মাঝে সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন নীতি অবলম্বন করবেন। সকলের সমান কল্যাণ কামনা করবেন। কারো প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়বেন না এবং কাউকে বঞ্চিত করবেন না। ন্যায় ও সুষম নীতি অবলম্বন করবেন।

নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে কিছু দান করলেন। আমার মা 'আমরাহ বিনতে রাওয়াহা বললেন, আমি এতে সন্তুষ্ট নই যতক্ষণ আপনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এর সাক্ষী না বানান। তখন আমার পিতা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট গিয়ে বললেন, আমি 'আমরাহ বিনতে রাওয়াহার গর্ভজাত আমার এই সন্তানকে একটা বস্তু দান করেছি। এতে 'আমরাহ আমাকে বলেছে, আমি যেন আপনাকে সাক্ষী করি। তিনি (সাঃ) বললেন, তুমি কি তোমার সকল সন্তানকে এর অনুরূপ দান করেছ।

তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং সকল সন্তানদের মধ্যে সমতা বিধান কর। নু'মান (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমার পিতা ফিরে এলেন এবং আপন দান ফিরিয়ে নিলেন।

সন্তান পুত্র হোক বা কন্যা হোক আচরণের ক্ষেত্রে এ দু'য়ের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা ইসলাম সমর্থন করে না। কারণ অসম আচরণে সন্তানদের অনুভূতিতে আঘাত লাগে তাদের অন্তরে গোপন রাখে একে অপরের প্রতি দুঃখ, ভালবাসার স্থলে ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক মনোভাব স্থান পায়, পরস্পরের মধ্যে ঐক্যের স্থলে সৃষ্টি হয় বিবাদ ও অনৈক্য। তাই এহেন পক্ষপাতমূলক কাজ হতে পিতাকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে।

১০. বিবাহ প্রদান এবং বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা কন্যাকে আশ্রয় দানঃ

সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাকে বিবাহ দেয়া পিতার দায়িত্ব। শিশু যখন যৌবনে পদার্পন করে তখন তার চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন ঘটে, তখন সে নতুন কিছুর সন্ধানে উন্মুখ হয়। সে যেকোন সময় বিপদগামী হতে পারে। তাই পিতার একান্ত উচিৎ উপযুক্ত পাত্র/পাত্রী নির্বাচন করে তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করা। বিবাহ মানুষকে পাপ কাজ হতে বিরত রাখে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 'বিবাহ দৃষ্টিকে নিম্নগামী করে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে'। কোন কারণে কন্যা যদি স্বামী কর্তৃক পরিত্যাক্তা হয় কিংবা বিধবা বা অসহায় হয়ে পড়ে, তখন পিতা সেই ভাগ্যাহতা কন্যাকে সাদরে গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, আশ্রয় ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবেন। কোন অবস্থাতেই পিতা তার ব্যাপারে বিমুখ হবেন না। সন্তানের এ অধিকার পিতার নিকট প্রাপ্য।

১১. দাম্পত্য সম্প্রীতি বৃদ্ধি পূর্বক কল্যাণ কামনা করাঃ

শিশু সর্বপ্রথম প্রভাবিত হয় তার পিতা-মাতার দ্বারা। কারণ শিশু তার আচার-আচরণে তাদেরকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করে। তাই মাতা-পিতার কর্তব্য সন্তানের সুস্থ ও স্বাভাবিক মন-মানসিকতা বিকাশের জন্য তাদের সামনে সুন্দর চরিত্র ও উত্তম আচরণ প্রকাশ করা। অর্থাৎ পিতা-মাতা উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতিময় দাম্পত্য জীবন বজায় রাখা। পিতা-মাতার মধ্যে মনোমালিন্য ও কলহ-বিবাদ থাকলে সন্তানের উপর তার বিরূপ প্রভাব পড়ে। যে সমস্ত পিতা-মাতার মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ বিরাজমান থাকে, সেসব মা-বাবার সন্তানেরা স্বাভাবিকভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে থাকে। সন্তানের ব্যাপারে পিতা-মাতার মাঝে যেন কোন প্রকার অন্যমনস্কতা ও শৈথিল্যের সৃষ্টি না হয়, সে ব্যাপারে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে।

সন্তানকে শিক্ষা-দীক্ষা, লালন-পালন ও জাগতিক ব্যাপারে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার পর পিতার অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে দো'আ করা।

যেমন- 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের এমন স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে আল্লাহভীরুদের জন্য নেতা নিযুক্ত কর' *(ফুরক্বান ২৫/৭৪)*। অপরপক্ষে সন্তানকে কোন অভিশাপ বা বদদো'আ করা পিতার জন্য শোভনীয় নয়।

এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ)-এর নিকট এসে নিজের এক পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করল। তিনি বললেন, 'তাকে তুমি কোনরূপ বদদো'আ করেছ কি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তবে তুমি তাকে নষ্ট করেছ'।

আল-কুরআনের আলোকে সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্য সম্পর্কিত উক্তিঃ

১। সন্তানকে তাওহীদ শিক্ষা দেওয়াঃ

وَ اِذۡ قَالَ لُقۡمٰنُ لِابۡنِهٖ وَ هُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ لَا تُشۡرِكۡ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ الشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيۡمٌ

আর স্মরণ কর, যখন লুকমান তার পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিল, 'প্রিয় বৎস, আল্লাহর সাথে শিরক করো না; নিশ্চয় শিরক হল বড় জুলুম। (৩১. লুকমান ১৩)

২। সন্তানকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়াঃ

يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَ اۡمُرۡ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَ انۡهَ عَنِ الۡمُنۡكَرِ وَ اصۡبِرۡ عَلٰى مَاۤ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنۡ عَزۡمِ الۡاُمُوۡرِ

হে আমার প্রিয় বৎস, সালাত কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎকাজে নিষেধ কর এবং তোমার উপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য ধর। নিশ্চয় এগুলো অন্যতম দৃঢ় সংকল্পের কাজ। (৩১. লুকমান ১৭)

৩। সন্তানকে আদব বা শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়াঃ

وَ لَا تُصَعِّرۡ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمۡشِ فِى الۡاَرۡضِ مَرَحًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخۡتَالٍ فَخُوۡرٍ. وَ اقۡصِدۡ فِىۡ مَشۡيِكَ وَ اغۡضُضۡ مِنۡ صَوۡتِكَ ؕ اِنَّ اَنۡكَرَ الۡاَصۡوَاتِ لَصَوۡتُ الۡحَمِيۡرِ

আর তুমি মানুষের দিক থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। আর যমীনে দম্ভভরে চলাফেরা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক, অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না। আর তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, তোমার আওয়াজ নীচু কর; নিশ্চয় সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হল গাধার আওয়াজ। (৩১. লুকমান ১৮-১৯)

৪। সন্তানদেরকে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে বিরত রাখাঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا قُوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ وَ اَهۡلِيۡكُمۡ نَارًا وَّ قُوۡدُهَا النَّاسُ وَ الۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعۡصُوۡنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمۡ وَ يَفۡعَلُوۡنَ مَا يُؤۡمَرُوۡنَ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর; যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাকূল, আল্লাহ

তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তারা সে ব্যাপারে তার অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়। (৬৬. তাহরীম ০৬)

৫। সন্তানের জন্য দুআ করাঃ

وَ الَّذِيۡنَ يَقُوۡلُوۡنَ رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ اَزۡوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعۡيُنٍ وَّ اجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِيۡنَ اِمَامًا

আর যারা বলে, হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন। (২৫. ফুরকান ৭৪)

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبۡ لِىۡ مِنۡ لَّدُنۡكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيۡعُ الدُّعَآءِ

সেখানে যাকারিয়া তার রবের কাছে প্রার্থনা করেছিল, সে বলল, ‘হে আমার রব, আমাকে আপনার পক্ষ থেকে উত্তম সন্তান দান করুন। নিশ্চয় আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী। (৩. আলে ইমরান ৩৮)

৬। কন্যা সন্তানের জন্য মনক্ষুণ্ন না হওয়াঃ

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾

যখন এদের কাউকে কন্যা সন্তান জন্মের সুখবর দেয়া হয় তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায় এবং সে ভিতরে ভিতরে গুমরে মরতে থাকে। (সুরা নাহল ৫৮)

৭। দরিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যা না করাঃ

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا لَعَلَّكُمْ بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ تَعْقِلُونَ﴾

হে মুহাম্মাদ! এদেরকে বলো, এসো আমি তোমাদের শুনাই তোমাদের রব তোমাদের ওপর কি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। দারিদ্রের ভয়ে নিজের সন্তানদেরকে হত্যা করো না, আমি তোমাদেরকে জীবিকা দিচ্ছি এবং তাদেরকেও দেবো. প্রকাশ্যে বা গোপনে অশ্লীল বিষয়ের ধারে কাছেও যাবে না। আল্লাহ যে প্রাণকে মর্যাদা দান করেছেন ন্যায় সংগতভাবে ছাড়া তাকে ধ্বংস করো

না। তিনি তোমাদের এ বিষয়গুলোর নির্দেশ দিয়েছেন, সম্ভবত তোমরা ভেবে-চিন্তে কাজ করবে। (সূরা আনআম ১৫১)

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾
দারিদ্র এর আশংকায় নিজেদের সন্তান হত্যা করো না। আমি তাদেরকেও রিযিক দেবো এবং তোমাদেরকেও। আসলে তাদেরকে হত্যা করা একটি মহাপাপ। (সুরা বনী ইসরাইল ৩১)

৮। সন্তানের পিতৃ পরিচয়ে বংশ পরিচয় নির্ধারিত হবেঃ

﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾
পালক পুত্রদেরকে তাদের পিতার সাথে সম্পর্কিত করে ডাকো। এটি আল্লাহর কাছে বেশী ন্যায়সংগত কথা। আর যদি তোমরা তাদের পিতৃ পরিচয় না জানো, তাহলে তারা তোমাদের দীনী ভাই এবং বন্ধু। না জেনে যে কথা তোমরা বলো সেজন্য তোমাদের পাকড়াও করা হবে না, কিন্তু তোমরা অন্তরে যে সংকল্প করো সেজন্য অবশ্যই পাকড়াও হবে। আল্লাহ ক্ষমাকারী ও দয়াময়। (সুরা আহযাব ৫)

আল-হাদিসের আলোকে সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্য সম্পর্কিত উক্তিঃ

১। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার কানে আযান দেয়াঃ

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ

উবাইদুল্লাহ ইবনু আবূ রাফি (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাতিমাহ (রা.) যখন আলী (রা.)-এর পুত্র হাসান (রা.)-কে প্রসব করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কানে সালাতের আযানের ন্যায় আযান দিয়েছিলেন। (আবু দাউদ ৫১০৫)

২। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাহনিয়া করানোঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُو لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ زَادَ يُوسُفُ وَيُحَنِّكُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ بِالْبَرَكَةِ

আয়িশাহ (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বাচ্চাদেরকে আনা হলে তিনি তাদের জন্য বরকতের দুআ করতেন। ইউসুফের বর্ণনায় রয়েছেঃ তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খেজুর চিবিয়ে তাদের মুখে দিতেন। এতে বরকতের জন্য কথাটি উল্লেখ নেই। (আবু দাউদ ৫১০৬)

৩। সন্তানের সুন্দর নাম রাখাঃ

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ، وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

আবূ দারদা (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে, তোমাদের ও তোমাদের পিতাদের নাম ধরে ডাকা হবে। তাই তোমরা তোমাদের সুন্দর নামকরণ করো। (আবু দাউদ ৪৯৪৮)

৪। যে সমস্ত নাম রাখা উত্তমঃ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَبْدُ اللَّهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ

ইবনু উমার (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মহামহিম আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় নাম হলো আব্দুল্লাহ এবং আব্দুর রাহমান। (আবু দাউদ ৪৯৪৯)

عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ، وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ

আবূ ওয়াহব আল-জিশামী (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা নবী-রাসূলগণের নামে নামকরণ করো। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় নাম হলো আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রাহমান। নামের মাঝে হারিস ও হাম্মাম হলো বিশ্বস্ত নাম এবং হারব ও মুররাহ হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট নাম। (আবু দাউদ ৪৯৫০)

৫। যে সকল নাম রাখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আছেঃ

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ أَفْلَحَ وَرَبَاحٍ وَيَسَارٍ وَنَافِعٍ.

সামুরাহ ইবনু জুনদাব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে চারটি নাম রাখতে নিষেধ করেছেন: আফলাহ, রাবাহ, ইয়াসার ও নাফি। (মুসলিম ২১৩৬)

৬। সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে আকিকা করাঃ

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

সামুরা ইবন জুনদুব (রা.) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, প্রত্যেক সন্তান স্বীয় আকীকার সাথে আবদ্ধ। তার পক্ষ হতে তা তার জন্মের

সপ্তম দিনে যবেহ করতে হবে। সেদিন তার মাথা মুণ্ডন করতে হবে এবং তার নাম রাখতে হবে। (নাসাঈ ৪২২১)

৭। সন্তানের পক্ষ থেকে সদাকাহ করাঃ

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ " يَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً. قَالَ فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ .

আলী ইবনু আবী তালিব (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একটি বকরী দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসানের আকীকা করেন এবং বলেনঃ হে ফাতিমা! তার মাথা নেড়া করে দাও এবং তার চুলের ওজনের অনুরূপ রূপা দান কর। তদানুযায়ী আমি তার চুল ওজন করলাম এবং তার ওজন এক দিরহাম বা তার কাছাকাছি হয়। (তিরমিজি ১৫১৯)

৮। সন্তানকে তাওহীদ শিক্ষা দেওয়াঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَقَالَ " يَا غُلاَمُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ " .

ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পিছনে ছিলাম। তিনি বললেনঃ হে তরুণ! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি- তুমি আল্লাহ্ তাআলার (বিধি-নিষেধের) রক্ষা করবে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখবে, আল্লাহ্ তাআলাকে তুমি কাছে পাবে। তোমার কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে আল্লাহ তাআলার নিকট চাও, আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে আল্লাহ্ তাআলার নিকটেই কর। আর জেনে রাখো, যদি সকল উন্মাতও তোমার কোন উপকারের উদ্দেশে ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে ততটুকু উপকারই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার জন্যে লিখে রেখেছেন। অপরদিকে যদি সকল

ক্ষতিই করতে সক্ষম হবে, যতটুকু আল্লাহ্ তাআলা তোমার তাকদিরে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে। (তিরমিজি ২৫১৬)

৯। সন্তানকে নামাজের ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়াঃ

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

আমর ইবনু শুআয়েব (রহ.) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমাদের সন্তানরা সাত বছরে উপনীত হবে, তখন তাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দেবে এবং তাদের বয়স যখন দশ বছর হবে তখন নামায না পড়লে এজন্য তাদেরকে মারপিট কর এবং তাদের (ছেলে-মেয়েদের) বিছানা পৃথক করে দিবে। (আবু দাউদ ৪৯৫)

১০। সন্তানকে আদর-স্নেহ করা, চুমু দেয়া ও আলিঙ্গণ করাঃ

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا. فَقَالَ الأَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا. فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ " مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ ".

আবূ হুরাইরাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা হাসান ইবনু 'আলীকে চুম্বন করেন। সে সময় তাঁর নিকট আকরা ইবনু হাবিস তামীমী উপবিষ্ট ছিলেন। আকরা ইবনু হাবিস বললেনঃ আমার দশটি পুত্র আছে, আমি তাদের কাউকেই কোন দিন চুম্বন দেইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পানে তাকালেন, অতঃপর বললেনঃ যে দয়া করে না, সে দয়া পায় না। (বুখারী ৫৯৯৭)

১১। সন্তানের লালন পালনের জন্য খরচ করাঃ

، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ. قَالَ " نَعَمْ لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ ".

উম্মু সালামাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আবূ সালামাহর সন্তানদের জন্য ব্যয় করলে তাতে আমার কোন সাওয়াব হবে কি? আমি তাদের এ (অভাবী) অবস্থায় ত্যাগ করতে পারি না। তারা তো আমারই সন্তান। তিনি বললেনঃ হাঁ, তুমি তাদের জন্য যা খরচ করবে তাতে তোমার সাওয়াব আছে। (বুখারী ৫৩৬৯)

১২। সন্তানদেরকে স্বাবলম্বী করে রেখে যাওয়াঃ

سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنْ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ لاَ فَقُلْتُ بِالشَّطْرِ فَقَالَ لاَ ثُمَّ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنْ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ

সাদ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হাজ্জে একটি কঠিন রোগে আমি আক্রান্ত হলে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার খোঁজ খবর নেয়ার জন্য আসতেন। একদা আমি তাঁর কাছে নিবেদন করলাম, আমার রোগ চরমে পৌঁছেছে আর আমি সম্পদশালী। একমাত্র কন্যা ছাড়া কেউ আমার উত্তরাধিকারী নেই। তবে আমি কি আমার সম্পদের দু তৃতীয়াংশ সাদাকা করতে পারি? তিনি বললেন, না। আমি আবার নিবেদন করলাম, তাহলে অর্ধেক। তিনি বললেন, না। অতঃপর তিনি বললেন, এক তৃতীয়াংশ আর এক তৃতীয়াংশও বিরাট পরিমাণ অথবা অধিক। তোমার ওয়ারিসদের অভাবমুক্ত রেখে যাওয়া, তাদেরকে খালি হাতে পরমুখাপেক্ষী অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম। আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য তুমি যে কোন ব্যয় করো না কেন, তোমাকে তার বিনিময় প্রদান করা হবে। এমনকি যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিবে (তারও প্রতিদান পাবে)। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! (আফসোস) আমি আমার সাথীদের হতে পিছনে থেকে যাব? তিনি বললেন, তুমি যদি পিছনে থেকে নেক ‘আমল করতে থাক, তাহলে তাতে তোমার মর্যাদা ও উন্নতি বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। তাছাড়া, সম্ভবত, তুমি পিছনে (থেকে যাবে)। যার ফলে তোমার দ্বারা অনেক কাওম উপকার লাভ করবে। আর অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ্‌! আমার সাহাবীগণের হিজরত বলবৎ রাখুন। পশ্চাতে ফিরিয়ে দিবেন না। কিন্তু

আফসোস! সাদ ইবনু খাওলার জন্য (এ বলে) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করছিলেন, যেহেতু মক্কায় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। (বুখারী ১২৯৫)

১৩। সন্তানদের শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়াঃ

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ " .

জাবির ইবনু সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ নিজের সন্তানকে শিষ্টাচার ও আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়া এক সা পরিমাণ বস্তু দান-খাইরাত করার চেয়েও উত্তম। (তিরমিজি ১৯৫১)

১৪। সন্তানদের ব্যাপারে ইনসাফ কায়েম করাঃ

عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ أَعْطَانِيْ أَبِيْ عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّيْ أَعْطَيْتُ ابْنِيْ مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِيْ أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَاتَّقُوْا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

আমির (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নুমান ইবনু বাশীর (রা.) কে মিম্বরের উপর বলতে শুনেছি যে, আমার পিতা আমাকে কিছু দান করেছিলেন। তখন (আমার মাতা) আমরা বিনতে রাওয়াহা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সাক্ষী রাখা ব্যতীত সম্মত নই। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসলেন এবং বললেন, আমরা বিনতে রাওয়াহার গর্ভজাত আমার পুত্রকে কিছু দান করেছি। হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে সাক্ষী রাখার জন্য সে আমাকে বলেছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সব ছেলেকেই কি এ রকম করেছ? তিনি বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তবে আল্লাহকে ভয় কর এবং আপন সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা কর। (বুখারী ২৫৮৭)

১৫। দরিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যা করা নিষেধঃ

عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا

وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيْمٌ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيْلَةَ جَارِك

'আবদুল্লাহ (ইবনু মাস'ঊদ) (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, কোন্ গুনাহ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, আল্লাহর জন্য অংশীদার দাঁড় করান। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এতো সত্যিই বড় গুনাহ। আমি বললাম, তারপর কোন্ গুনাহ? তিনি উত্তর দিলেন, তুমি তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করবে যে, সে তোমার সঙ্গে আহার করবে। আমি আরয করলাম, এরপর কোনটি? তিনি উত্তর দিলেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে তোমার ব্যভিচার করা। [বুখারি ৪৪৭৭, ৪৭৬১, ৬০০১, ৬৮১১, ৬৮৬১, ৭৫২০, ৭৫৩২; মুসলিম ১/৩৭, হাঃ ৮৬০] (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪১১৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৪১২২)

১৬। নবজাতকের মাথার চুল ওজন করে সমপরিমান দানঃ

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ " يَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً "

আলী ইবনু আবী তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একটি বকরী দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসানের আকীকা করেন এবং বলেনঃ হে ফাতিমা! তার মাথা নেড়া করে দাও এবং তার চুলের ওজনের অনুরূপ রূপা দান কর। তদানুযায়ী আমি তার চুল ওজন করলাম এবং তার ওজন এক দিরহাম বা তার কাছাকাছি হয়। (তিরমিজি ১৫১৯)

عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْغُلاَمُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ "

সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সকল শিশুই তার আকীকার সাথে বন্ধক (দায়বদ্ধ) অবস্থায় থাকে। জনুগ্রহণ করার সপ্তম দিনে তার পক্ষে যবেহ করতে হবে, তার নাম রাখতে হবে এবং তার মাথা নেড়া করতে হবে। (তিরমিজি ১৫২২, ইবনু মা-জাহ ৩১৬৫)

১৭। সন্তানের খাতনা করাঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ" الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ ".

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মানুষের স্বভাবগত বিষয় হলো পাঁচটিঃ খাতনা করা, নাভির নীচের পশম কামানো, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, গোঁফ ছাঁটা এবং (অতিরিক্ত) নখ কাটা। (সহিহ বুখারি ৫৮৮৯, আধুনিক প্রকাশনী- ৫৮৫৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৭৪৭

১৮। শিশুদের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করাঃ

عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ تُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ ".

'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললো। আপনারা শিশুদের চুম্বন করেন, কিন্তু আমরা ওদের চুম্বন করি না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আল্লাহ যদি তোমার হৃদয় হতে দয়া উঠিয়ে নেন, তবে তোমার উপর আমার কি কোন অধিকার আছে? [বুখারি, ৫৯৯৮, মুসলিম ৪৩/১৫, হাঃ ২৩১৭, আহমাদ ২৪৪৬২] (বুখারি, আধুনিক প্রকাশনী- ৫৫৬৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৪৫৯)

সন্তানকে আগে শিক্ষাদান পরে শাসন

সুস্থতার জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন অনস্বীকার্য, তবে তা স্বাস্থ্যরক্ষার মূল উপায় নয়। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজন পুষ্টিকর খাবার, পরিমিত বিশ্রাম এবং স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন। ঔষধ ও চিকিৎসারও প্রয়োজন আছে, তবে তা রোগ-ব্যধির নিরাময়ের জন্য। অতএব তা ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজন। শুধু ঔষধ সেবন করে স্বাস্থ্য রক্ষার প্রচেষ্টা হাস্যকর। এই মুলনীতি শুধু শারীরিক সুস্থতার ক্ষেত্রে নয়, নৈতিক ও চারিত্রিক সুস্থতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই শিশুর জীবন ও চরিত্র গঠনের জন্য প্রথম প্রয়োজন সুশিক্ষা। এটি তার ভালো গুণগুলিকে বিকশিত করবে এবং স্বভাবের মন্দ প্রবণতাগুলিকে দমন করবে। তাই চিন্তা ও হৃদয় এবং রুচি ও কর্মকে পরিশুদ্ধ করে একজন প্রকৃত মানুষরূপে তাকে গড়ে তুলবে। এজন্য শিশু-কিশোরের জীবন গঠনে সুশিক্ষা ও সঠিক তরবিয়তের প্রতি সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দেয়া উচিত। শিশুরা পরিবেশ থেকে অনেক কিছু শেখে, তাই তার চারপাশের পরিবেশে সুশিক্ষার উপাদান থাকা অপরিহার্য। পিতা-মাতা ও ভাই-বোনের আচরণ এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা ও আত্মীয়-স্বজনের ব্যবহার শিশুর চরিত্র গঠনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এরপরও শিশুকে হাতে ধরে ধরে অনেক কিছু শেখাতে হয়। দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি নিয়মকানুন, যেমন মিসওয়াক করা, পবিত্রতা রক্ষা করা, বাইতুল খালা (পায়খানা) থেকে বের হওয়ার আগে তা ভালোভাবে পরিষ্কার করা, হাত-পায়ের নখ কাটা, খাবার আগে ও পরে ভালোভাবে হাত ধোয়া, পরিপাটিভাবে খাবার গ্রহণ করা, বইপত্র ও কাপড়-চোপড় গুছিয়ে রাখা, বড়কে সম্মান করা, ছোটকে স্নেহ করা, মেহমানের সমাদর করা, ছোটখাটো কাজে পিতামাতার সহযোগিতা করা, কাজের ছেলে-মেয়ের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, সহপাঠী ও প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করা ইত্যাদি বিষয়গুলো শিশুকে হাতে ধরে শেখাতে হয়। সবকিছু সে নিজে নিজে শিখবে, এমন মনে করা ঠিক নয়। সবাই সব কিছু নিজে নিজে শেখে না। আমরা বড়রাও কি সব কিছু নিজে নিজে শিখি? এজন্য শেখানোর কোনো বিকল্প নেই। শিশু কোনো অসমীচীন আচরণ করলে সঙ্গে সঙ্গে শাসনের দণ্ড হাতে তুলে নেওয়া উচিত নয়। এই নীতি অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই বেশ ধৈর্য্যসাপেক্ষ। কারণ এমন বিষয় মোটেই কম নয় যেখানে বড়দের মনে হতে পারে যে, এই সামান্য বিষয়টাও কি বলে দিতে হয়? প্রতিদিন ভোরে মিসওয়াক করবে-এটা ক'বার বলা যায়? এ তো সাধারণ রুচির বিষয়? সব ঠিক, কিন্তু আগে তো তার মধ্যে রুচিটা তৈরি করতে হবে। এজন্য এই ছোট ছোট বিষয়গুলোও বার বার শেখানোর প্রয়োজন পড়ে। প্রাত্যহিক জীবনের সাধারণ আদব-কায়েদায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠা পর্যন্ত পিতামাতাকে ধৈর্য্যের সঙ্গে শেখাতে হবে। এরপর শুধু পর্যবেক্ষণই যথেষ্ট হবে। বাচ্চাকে প্রথমে শান্তভাবে বোঝাতে হবে, তার মধ্যে গুরুত্বের

অনুভূতি জাগ্রত করতে হবে। অন্যথায় বিরক্তি বা শাসন উল্টো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। কারণ যার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করা হচ্ছে তার মধ্যে যদি বিরক্তির হেতু বোঝার-যোগ্যতাই না থাকে তাহলে সে একে অযৌক্তিক বিরক্তি বলে ধরে নেবে। সে ভাববে যে, আমার সঙ্গে শুধু খারাপ ব্যবহার করা হয়, আমাকে আসলে দেখতে পারে না। শুধু শিশু-কিশোরদের বেলায় নয়, সকল অধীনস্থ-দের বেলায় এটা সত্য। স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি শুধু বিরক্তই হন, কিন্তু তার বিরক্তির কারণ খুলে না বলেন কিংবা বিরক্তির যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে না পারেন তাহলে স্বাভাবিকভাবে স্ত্রী ভাবতে পারে যে, সে আমাকে দুই চোখে দেখতে পারে না। একই ভাবে স্ত্রী যদি তার বিরক্তির কারণ স্বামীকে বোঝাতে না পারেন তাহলেও স্বামীর মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি হবে। অনেক ক্ষেত্রে এমন হয় যে, একটি বিষয় আপনার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আপনার অধীনস্তদের কাছে তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তখন প্রথম কাজ হবে তাকে বিষয়টির গুরুত্ব বোঝানো। আর তা একদিনে, এক বার বলার দ্বারা নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে ধৈর্য্য ধারণের বিকল্প নেই। এই ক্ষেত্রগুলো আসলে আল্লাহর পক্ষ হতে পরীক্ষার ক্ষেত্র এবং আখিরাতের পুঁজি সঞ্চয়ের ক্ষেত্র। প্রাত্যহিক জীবনের আচরণগত বিষয় ছাড়াও শিক্ষার আরো অনেক বিষয় রয়েছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, শিশুর হৃদয়বৃত্তিকে জাগ্রত করা। অন্তরের পরিশুদ্ধি হচ্ছে আচরণের বিশুদ্ধতার নিয়ামক শক্তি। এটা ঠিক যে, মানুষ মাত্রেরই হৃদয় আছে, অতএব হৃদয়-বৃত্তিও আছে, কিন্তু হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলো প্রথমত সুপ্ত অবস্থায় থাকে। এজন্য পরিচর্যা না হলে তা বিকশিত হয় না। আর শৈশবেই যদি তা বিকশিত না হয় তাহলে বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার পর তা বিকশিত করা কঠিন। এজন্য শিশুর সঙ্গে সাহাবা-তাবেয়ীন ও সালাফে সালেহীনের হৃদয়বৃত্তির বিভিন্ন ঘটনা আলোচনা করে তাদেরকে দয়া-মায়া, সহানুভূতি ও সহনশীলতা ইত্যাদি গুণের সঙ্গে পরিচিত করে তুলতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা হল, শিশুর সঙ্গে সহৃদয় আচরণ করে সহৃদয়তার বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। মুখের কথার চেয়ে বাস্তব আচরণের প্রভাব অনেক বেশি হয়ে থাকে। তবে আলোচনার প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না, বিশেষত শিশুরা তাদের গুরুজনের কথা অন্তর থেকে বিশ্বাস করে। গুরুজন যদি অবিশ্বাস করতে না শেখায় তাহলে শিশুরা গুরুজনের কথায় অবিশ্বাস করে না। শিশুদের বিশ্বাস রক্ষা করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। শিক্ষার পাশাপাশি শিশুর আচরণগুলি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করাও পিতামাতার কর্তব্য। শিশুর যে আচরণ থেকে মমতা ও সহানুভূতি প্রকাশ পায় তা উৎসাহিত করা এবং যে আচরণে হিংস্রতা ও নির্দয়তা প্রকাশ পায় তা ধীরে ধীরে সংশোধন করা উচিত। এ বিষয়ে অবহেলা করা চরম ক্ষতির কারণ হয়ে যেতে পারে। কোনো শিশুকে যদি দেখা যায় যে, অসহায় মানুষ দেখলে তার কষ্ট হয় তাহলে তার এই মানসিকতার মূল্যায়ণ করা উচিত এবং তার শিশু-হৃদয়ে সহানুভূতির যে বীজ অঙ্কুরিত

হয়েছে তা পরিচর্যার মাধ্যমে বিকশিত করা উচিত। এ প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কেরাম ও আমাদের পূর্বসূরীদের জীবনী আলোচনা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হতে পারে। পক্ষান্তরে কোনো শিশুকে যদি দেখা যায়, পশু-পাখীকে কষ্ট দিয়ে বা কাজের ছেলেমেয়ের সঙ্গে নির্দয় আচরণ করে আনন্দ পাচ্ছে তাহলে তখন থেকেই তার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। জুলুম-অত্যাচার যে অত্যন্ত গর্হিত কাজ এবং জালিম ও অত্যাচারীকে যে আল্লাহ তাআলা তাআলা ঘৃণা করেন-এই বোধ তার মধ্যে জাগ্রত করতে হবে। ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা থেকে জালিমের পরিণতি আলোচনা করে তার কোমল মনে জুলুমের প্রতি ঘৃণা ও ভয় জাগিয়ে তুলতে হবে। বলাবাহুল্য যে, তা একদিনেই হয়ে যাবে না, ধীরে ধীরে বার বার বোঝানো হলে তার কোমল মন বিষয়গুলিকে গ্রহণ করবে এবং তার আচরণে পরিবর্তন আসবে। শাসনের আগে এই কর্তব্যটুকু পালন করা পিতামাতার কর্তব্য।

সন্তানদের শাসনের নীতি

ইসলামের সকল শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ এবং সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য পূর্ণ কল্যাণকর। তা'লীম-তরবিয়তের ক্ষেত্রেও ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ দিক-নির্দেশনা রয়েছে। তাতে যেমন নম্রতা ও সহনশীলতার নির্দেশনা আছে, তেমনি আছে শাস্তি ও শাসনের বিধান। তরবিয়তের ক্ষেত্রে শাস্তির কোনো প্রয়োজন নেই-এটা যেমন অবাস্তব কথা তেমনি শাস্তিকে তরবিয়তের প্রধান উপায় মনে করা ঠিক নয়। বস্তুত শাস্তি হচ্ছে ঔষধের মতো। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যেমন ঔষধের প্রয়োজন তেমনি তা'লীম-তরবিয়তের ক্ষেত্রে প্রয়োজন শাস্তি ও শাসনের। তবে একথা বলাই বাহুল্য যে, সুস্বাস্থ্যের মূল উপাদান ঔষধ নয়। সুস্বাস্থ্যের জন্য মূল উপাদান হল পুষ্টিকর খাবার, পরিমিত শরীরচর্চা, প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ও শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনযাপন ইত্যাদি। এরপর অসুখ-বিসুখ হলে প্রয়োজন হয় চিকিৎসা ও ঔষধ ব্যবহারের। অতএব এর প্রয়োজনীয়তা বিশেষ অবস্থার সঙ্গে সীমাবদ্ধ। আর এ ক্ষেত্রেও রোগ-নির্ণয়, ঔষধ নির্বাচন, ব্যবহারের নিয়ম ও মাত্রা ইত্যাদির জন্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হয়। তরবিয়তের ক্ষেত্রে শাস্তির বিষয়টিও এখান থেকে অনুমান করে নেওয়া যায়।

মূলপন্থা নম্রতা ও সহনশীলতা

শিশুদের ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব শাসন এড়িয়ে চলা উচিত। ধৈর্য্য ও সহনশীলতা সঙ্গে তাকে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। যখন শাসনের প্রয়োজন হয় তখন পূর্ণ সংযম ও দূরদর্শিতার পরিচয় না দিলে শিশুর উপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়।

আল্লামা ইবনে খালদূন রাহ. ''আলমুকাদ্দিমা''য় লিখেছেন যে, 'শিশুর সঙ্গে যদি অতিরিক্ত দুর্ব্যবহার ও কঠিন আচরণ করা হয় তাহলে তারা ভীরু, অলস ও পলায়নপর হয়ে যায়। তাদের উদ্যম ও প্রফুল্লতা বিনষ্ট হয়ে যায় এবং চ্যালেঞ্জ গ্রহণের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। 'শাস্তি থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা মিথ্যাচার ও তোষামোদ রপ্ত করে ফেলে। একসময় এগুলোই তাদের স্বভাবে পরিণত হয় এবং আত্মমর্যাদা, সৎসাহস ও উন্নত চিন্তা ইত্যাদি গুণাবলি থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। এরপর শাস্তি ও চাপের পরিবেশ থেকে মুক্তি লাভ করলেও ওই সব গুণাবলি আর তার মধ্যে সৃষ্টি হয় না।'

ইমাম গাযালী রাহ. শিশুদের তরবিয়ত-সংক্রান্ত এক দীর্ঘ আলোচনায় বলেন, 'শিশু যখন কোনো ভালো কাজ করে তখন তাকে বাহবা দেওয়া উচিত এবং অন্যদের সামনে তাকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করা উচিত। পক্ষান্তরে কখনো যদি বিপরীত কিছু দেখা যায় তাহলে তা না দেখার ভান করে এড়িয়ে যাওয়া উচিত। বিশেষত শিশু যখন নিজেই তা লুকিয়ে রাখতে সচেষ্ট। আর তাকে সর্বদা ধমক দেওয়া উচিত নয়। কেননা এতে সে ভৎর্সনা

শুনতে অভ্যস্থ হয়ে উঠবে। পিতা তাকে মাঝে মাঝে ভৎর্সনা করবেন। আর মা তাকে পিতার ভয় দেখিয়ে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবেন।'-ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন

শিশুর মনোদৈহিক বিকাশে তার চারপাশের পরিবেশ কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা ইবনে সীনা-র একটি বক্তব্য থেকে বোঝা যায়।

ইবনে সীনা বলেন, 'শিশুর স্বভাব-চরিত্রের প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। লক্ষ্য রাখতে হবে, তাকে যেন চরম ক্রোধ, প্রচন্ড ভীতি, কিংবা দুঃখ-বেদনা ও রাত্রি জাগরণের মুখোমুখি না হতে হয়। তার চাহিদা ও পছন্দের প্রতি লক্ষ করতে হবে যেন সেগুলো পূরণ করা যায় আর তার অপছন্দগুলোও লক্ষ করতে হবে যেন সেগুলো থেকে তাকে দূরে রাখা যায়। এর ইতিবাচক প্রভাব তার শরীর ও মন উভয় ক্ষেত্রেই পড়ে থাকে। কেননা, শিশুর মন যদি ভালো থাকে তাহলে তার স্বভাব ও আচরণও সুন্দর হবে। আর উত্তম স্বভাব ও আচরণ যেমন শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিত করে তেমনি মানসিক সুস্থতাও।'

উপরোক্ত মুসলিম মনীষীদের বক্তব্য সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মত। যে কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তিই এর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করবেন না।

আমরা যদি একদম গোড়ায় যাই এবং জগতের সর্বোত্তম শিক্ষক হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে, শিশুদের সঙ্গে তাঁর আচরণ কত কোমল ছিল।

এখানে হাদীস শরীফ থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলোঃ

১। হযরত বুরায়দা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে হাসান ও হুসাইন মসজিদে প্রবেশ করল। তাদের পরনে ছিল লাল রংয়ের জামা। তারা দৌড়ে আসছিল এবং পড়ে যাচ্ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন খুতবা শেষ না করেই মিম্বর থেকে নেমে এলেন এবং তাদেরকে কোলে তুলে নিলেন। এরপর বললেন, 'তোমাদের সম্পদ ও সন্তান তোমাদের জন্য পরীক্ষার বিষয়।' আমি শিশু দু'টিকে দেখলাম যে, তারা দৌড়ে আসছে এবং পড়ে যাচ্ছে। তখন আমার পক্ষে ধৈর্য্য ধারণ করা সম্ভব হল না।'-জামে তিরমিযী ২/২১৮

২। হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি দীর্ঘ নামাযের ইচ্ছা নিয়ে নামায আরম্ভ করি, কিন্তু যখন কোনো শিশুর ক্রন্দনের আওয়াজ শুনি তখন নামায সংক্ষিপ্ত করে দেই। কেননা, আমি জানি, শিশুর ক্রন্দনে মার অবস্থা কেমন হয়!' (সহীহ বুখারী, হাদীস ৭০৯)

প্রসঙ্গত, শিশুদের তা'লীম-তরবিয়তের দায়িত্বে নিয়োজিত সম্মানিত উস্তাদগণের জন্য এখানে চিন্তার উপকরণ রয়েছে। শিশুদের শাসনের সময় আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণে চিন্তা করতে পারি যে, এ অবস্থাটা যদি তার মার সামনে হয় তাহলে তাঁর কেমন লাগবে?

৩। হযরত আনাস রা. কয়েকজন শিশুর নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে সালাম দিলেন। এরপর বললেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে শিশুদের সালাম দিয়েছেন।' (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৬২৪৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২১৬৮)

৪। ইমাম মুসলিম রাহ. বর্ণনা করেন, লোকেরা তাদের প্রথম ফল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়ে আসত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হাতে নিয়ে দুআ করতেন-'ইয়া আল্লাহ, আমাদের ফলফলাদিতে বরকত দিন, আমাদের শহরে বরকত দিন, আমাদের ছা' তে বরকত দিন, আমাদের মুদে বরকত দিন।' এরপর কোনো শিশুকে ডেকে তা দিয়ে দিতেন। (সহীহ মুসলিম ১/৪৪২)

শিশুদের সঙ্গে কোমল আচরণই ছিল নবী করীম (সাঃ)এর আদর্শ

পরবর্তী সময়ের মনীষীগণ যতই গবেষণা করেছেন ততই তার সুফল প্রকাশিত হয়েছে। শিশুর মনোদৈহিক বিকাশে কোমল ব্যবহারের বিকল্প নেই।

এজন্য শিশুর তরবিয়তের ক্ষেত্রে মূল পন্থা হল, কোমলতা ও সহনশীলতা। যে কোনো ভুল-ত্রুটি নজরে পড়লেই শাস্তির কথা ভাবা উচিত নয়। প্রথমে ক্ষমার কথা চিন্তা করা উচিত। ইমাম নববী রাহ. বলেন, 'তাকে (ছাত্রকে) আপন সন্তানের মতো মমতা করবে এবং তার অন্যায় আচরণ ক্ষমা করে দিবে। কখনো কোনো বে-আদবী প্রকাশ পেলে ক্ষমা করে দিবে। কেননা, মানুষ মাত্রই ভুল করে থাকে।' এরপর কোমলতার সঙ্গে সংশোধনের চেষ্টা করবে।

শিশুর মন-মানস এবং স্বভাব-প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রাখা

কখনো শাস্তির প্রয়োজন হলে ঔষধ নির্ণয়ের মতো শাস্তির ধরন ও পরিমাণ নির্ণয়ে অত্যন্ত বিচক্ষণ হতে হবে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্য ক্রোধ চরিতার্থ করা নয়; উদ্দেশ্য হল শিশুর সংশোধন। এজন্য শাস্তির বিষয়ে অত্যন্ত ধৈর্য্য ও সংযমের পরিচয় দেওয়া কর্তব্য।

সব শিশু প্রকৃতিগতভাবে এক ধরনের নয়। কেউ সামান্য তাম্বীহ দ্বারাই ঠিক হয়ে যায় আবার কাউকে শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন হয়। কেউ শাস্তির দ্বারা সংশোধিত হয়, কেউ আরো বিগড়ে যায়। এ বিষয়গুলো আগে থেকেই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে স্থির করা উচিত এবং যার জন্য যে পরিমাণ তাম্বীহ প্রয়োজন তার জন্য তা-ই প্রয়োগ করা উচিত।

তাম্বীহ ও শাস্তির ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রম অনুসরণ করা

অনেকে বেত ও শাস্তিকে সমার্থক মনে করে থাকেন। যেন বেত ছাড়া শাস্তির কোনো উপায় নেই। অথচ এটা হল সর্বশেষ ব্যবস্থা। পূর্বের ব্যবস্থাগুলো পরীক্ষা না করে চুড়ান্ত ব্যবস্থা প্রয়োগ করা কোনোভাবেই সমীচীন নয়।

ইবনে মাছকইুয়াহ বলেন, 'শিশুর প্রথম ভুল ক্ষমা করে দেওয়া উচিত। পুনরায় ওই ভুল হলে পরোক্ষভাবে তাম্বীহ করবে। যেমন তার উপস্থিতিতে বলা হল, 'এই কাজ করা ঠিক নয়। কেউ যদি তা করে থাক তবে সাবধান হয়ে যাও। এরপর সরাসরি তাম্বীহ করা যায়। এরপরও যদি ওই ভুল হয় তাহলে হালকা প্রহার করা যায়। এই সবগুলো পর্যায় অতিক্রম করার পরও যদি দেখা যায় সে সংশোধিত হয়নি তাহলে কিছুদিন তাকে আর কিছু বলবে না। এরপর আবার প্রথম থেকে আরম্ভ করবে। মনে রাখবেন, মা-বাবা যদি দুনিয়া থেকে চলে যায় আর সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং গোনাহে লিপ্ত থাকে তাহলেও মা-বাবা-যদি দায়িত্বে অবহেলা করে থাকেন- তাদের দায়িত্বে অবহেলা করার কারণে এর কিছু দায়ভার তাদের উপরও বর্তাবে।

আমাদের সকলেরই আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে। তিনি আমাদেরকে কেবল এই দায়িত্ব দেননি যে, নিজে শরীয়তের পাবন্দ হব এবং আল্লাহর বিধি-বিধান পালন করব। বরং নিজের পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি এমনকি অধীনস্থদেরসহ সবার জিম্মাদারী আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর দিয়েছেন।

সন্তানদের সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তাঁর মাধ্যমেই সমাপ্তি ঘটেছে আসমানী ওহীর আগমনধারা এবং পূর্ণতা পেয়েছে ওহীর তালীম ও শিক্ষা। তিনি ওহীর শিক্ষাকে জীবনে বাস্তবায়ন করে জগদ্বাসীর জন্য রেখে গেছেন নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ আদর্শ। তিনিই আমাদের উসওয়া ও আদর্শ।

ইরশাদ হয়েছে-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا.

নিশ্চয় আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ- এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে। (সূরা আহযাব - ৩৩ : ২১)

তাঁর কথা ও মৌনতা, হাসি-কান্না, উঠা-বসা, চলাফেরা সবকিছুতেই রয়েছে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। শিক্ষক হিসাবে তিনি আদর্শ শিক্ষক। স্বামী হিসাবে আদর্শ স্বামী। পিতা হিসাবে আদর্শ পিতা। বন্ধু হিসাবে আদর্শ বন্ধু। সেনাপতি হিসাবে আদর্শ সেনাপতি। শাসক হিসাবে আদর্শ শাসক।

দয়া-মমতা, হায়া-লজ্জাশীলতা, ক্ষমা ও সহনশীলতায় তিনি উৎকৃষ্ট উপমা। অনুগ্রহ-বদান্যতা, আখলাক-চরিত্র, সুস্থ রুচি, উন্নত চিন্তায় তিনি প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইখলাস-একনিষ্ঠতা, ইবাদত-বন্দেগি, তাকওয়া-আল্লাহভীতি ও দুনিয়াবিমুখতায় তিনি সর্বোত্তম উসওয়া। মানবতার ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি ও কল্যাণ সাধনে তাঁর উসওয়া ও আদর্শের কোনো বিকল্প নেই।

তিনি তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন। আর এসব বিষয়ের প্রতি তাঁর ঈমানই ছিল সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী। তিনি ইবাদত ও তাকওয়ার প্রতি আহ্বান করেছেন আর তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বড় আবেদ ও মুত্তাকী। তিনি বান্দার হকের দাওয়াত দিয়েছেন, আর এই হক আদায়ের ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন সর্বোত্তম উপমা। তিনি উত্তম চরিত্রের দাওয়াত দিয়েছেন আর তিনিই ছিলেন সুন্দর আখলাকের অনুপম দৃষ্টান্ত। তিনি সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় সাম্য ও সমতা, ন্যায় ও ইনসাফ, সেবা ও খেদমত, সততা ও আমানতদারি, আত্মত্যাগ ও স্বার্থত্যাগ, নসীহত ও হিতকামনা, সুস্থ নীতি ও উন্নত নৈতিকতার প্রতি আহ্বান করেছেন আর তিনিই ছিলেন সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় উজ্জ্বল নক্ষত্র। এভাবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত শিক্ষা ও বিধানের তিনিই ছিলেন বাস্তব নমুনা। মোটকথা, জীবন ও জগতের সকল অঙ্গনে সঠিক ও শ্রেষ্ঠ দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্যই তাঁর আগমন এবং তাঁর পবিত্র সীরাত ও আদর্শই আমাদের আদর্শ।

নবীজীর ছিল তিন পুত্র; কাসেম রা., আবদুল্লাহ রা. ও ইবরাহীম রা.। এবং চার কন্যা; যয়নব রা., রুকাইয়া রা., উম্মে কুলসুম রা. ও ফাতেমা রা.।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন ছেলে-মেয়েদের খুব মহব্বত করতেন, আদর- স্নেহ করতেন। মায়াভরা আদর-যত্নে, হৃদয় উজাড় করা ভালবাসায় তাদের লালন-পালন করেছেন।

ইবরাহীমের জন্ম হলে দুধ পান করানোর জন্য তাকে আবু সাইফ নামক এক সাহাবীর স্ত্রীর হাতে সোপর্দ করা হয়। আবু সাইফের বাড়ি মদীনার 'আওয়ালী'তে। মদীনার আশপাশের গ্রামগুলোকে 'আওয়ালী' বলা হয়। মদীনা হতে আওয়ালীর নিকটমত গ্রামের দূরত্ব ছিল দুই মাইল এবং দূরতম গ্রামের দূরত্ব আট মাইল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানদের প্রতি কত গভীর স্নেহ ও ভালবাসা লালন করতেন- এর একটা বিবরণ দিয়েছেন সায়্যিদুনা আনাস রা.। তিনি বলেন, ইবরাহীম মদীনার আওয়ালীতে দুধ পান করতেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে যেতেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে যেতাম। তিনি তাদের ঘরে প্রবেশ করতেন। ঘর থাকত ধূয়রাচ্ছন্ন। কারণ, ধাত্রীর স্বামী ছিল কর্মকার। ঘরে প্রবেশ করে নবীজী ইবরাহীমকে কোলে নিতেন, আদর করে চুমু খেতেন। এরপর চলে আসতেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩১৬

আরেক বর্ণনায় এসেছে, তিনি তাকে কোলে নিয়েছেন, আদর করে চুমু খেয়েছেন এবং নাকে-মুখে লাগিয়েছেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৩০৩

সন্তানের প্রতি হৃদয়ের গভীরে কেমন মায়া-মমতা থাকলে পরিবারের হক, রাষ্ট্রের দায়িত্ব, উম্মতের দাওয়াতী ও ইসলাহী যিম্মাদারি আদায়ের সাথে সাথে মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে চলে যেতেন শিশু-পুত্র ইবরাহীমকে শুধু দেখার জন্য! শুধু তাঁকে জড়িয়ে ধরে আদর-স্নেহ করার জন্য!

নবীজীর পুত্রগণ শৈশবেই ইনতিকাল করেন। ইবরাহীম রা. ষোল বা আঠারো মাস বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর ওফাতের সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হৃদয়ে কেমন ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা ছেয়ে গিয়েছিল তা বোঝা যায়।

সায়্যিদুনা আনাস রা. এর বর্ণনা থেকে-

ইবরাহীমকে দেখার জন্য নবীজীর সাথে আমরা আবু সাইফের বাড়িতে গেলাম। ইবরাহীমের তখন প্রাণ ওষ্ঠাগত। তা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল।

আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও (কাঁদছেন)? তিনি বললেন, এটা হল রহমত। এরপর আবারও তাঁর চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল এবং তিনি বললেন-

إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ، وَالقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ.

নিশ্চয় চক্ষু অশ্রু ঝরাচ্ছে এবং হৃদয় বিগলিত হচ্ছে। তবে আমরা মুখে কেবল তাই বলব, যা আমাদের রব পছন্দ করেন। তোমার বিরহে আমরা বড়ই ব্যথিত হে ইবরাহীম! (সহীহ বুখারী, হাদীস ১৩০৩)

কন্যার প্রতি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হৃদয় ছিল আদর-স্নেহ ও প্রীতি-ভালবাসায় ভরপুর।

নবীজীর বড় মেয়ে যয়নব রা.-এর বিয়ে হয় আবুল আস ইবনে রবীর সঙ্গে। হিজরতের সময় আবুল আস রা. ইসলাম গ্রহণ করেননি। কুরাইশ যখন যুদ্ধ করার জন্য বদর প্রান্তে রওয়ানা হল আবুল আসও তাদের সঙ্গী হলেন এবং কুরাইশ বন্দীদের সাথে তিনিও বন্দী হলেন। উম্মুল মুনিনীন আয়েশা রা. বলেন, মক্কার লোকেরা নিজেদের বন্দীদের মুক্তির জন্য মুক্তিপণ পাঠায়। যয়নব রা.-ও আপন স্বামী আবুল আসের মুক্তির জন্য কিছু জিনিস পাঠান। তাতে একটা হার ছিল, যা খাদীজা রা. যয়নব রা.-কে বিবাহের সময় দিয়েছিলেন। হারটি দেখে (কন্যার স্নেহে) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতিশয় বিগলিত হয়ে পড়েন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন-

إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا، وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا، فَافْعَلُوا.

তোমরা ভালো মনে করলে যয়নবের বন্দীকে মুক্তি দিয়ে দাও এবং তার হারটি ফেরত পাঠিয়ে দাও।

তারা বললেন, অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরপর তারা আবুল আসকে মুক্তি দিয়ে দেন এবং যয়নবের হারটি ফেরত পাঠিয়ে দেন। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৬৯২; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৬৩৬২)

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বিতীয় কন্যা হযরত রুকাইয়া রা.। তার বিয়ে হয় হযরত উসমান রা.-এর সাথে। বদরযুদ্ধের সময় রুকাইয়া রা. খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর সেবা-শুশ্রূষার জন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান রা.-কে যুদ্ধে না গিয়ে মদীনায় থাকার নির্দেশ দেন এবং তাঁকে সান্তনা দিয়ে বলেন-

إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ.

নিশ্চয় তুমি বদরযুদ্ধে যোগদানকারী একজন মুজাহিদের সমান সওয়াব এবং তার সমপরিমাণ গনীমতের অংশ পাবে। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৩১৩০)

তৃতীয় কন্যা উম্মে কুলসুম রা.-এর ওফাতের পর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কবরের পাশে গিয়ে বসলেন। তাঁর চোখ থেকে তখন অবিরাম অশ্রু ঝরছিল। (সহীহ বুখারী, হাদীস ১২৮৫)

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বকনিষ্ঠ কন্যা হযরত ফাতেমা রা.। তাঁর প্রতি নবীজীর আদর- সোহাগ ছিল সবচেয়ে বেশি। তিনি নবীজীর ঘরে এলে পিতৃস্নেহের উষ্ণতা দিয়ে তাঁকে বরণ করতেন। আয়েশা (রাঃ) শোনাচ্ছেন যে, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উঠা-বসা, আচার-অভ্যাস, চালচলন, আখলাক-চরিত্রে ফাতেমার চেয়ে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ আর কাউকে আমি দেখিনি। ফাতেমা নবীজীর কাছে এলে তিনি এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরতেন, তাকে চুমু দিতেন এবং নিজের আসনে বসাতেন। আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও যখন ফাতেমার কাছে যেতেন তিনিও উঠে এসে পিতাকে চুমু দিতেন এবং নিজের আসনে বসাতেন। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫২১৭; জামে তিরমিযী, হাদীস ৪২১০)

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো কন্যাদের সাদর সম্ভাষণ জানাতেন। আয়েশা রা. বলেন, একবার ফাতেমা হেঁটে আসছিল। তার হাঁটার ধরন ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতই। তাকে আসতে দেখে নবীজী বলে উলঠেন-

مَرْحَبًا بِابْنَتِي.

আমার কন্যাকে স্বাগতম!

এরপর তাকে নিজের ডানে বা বামে বসালেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৬২৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৪৫০)

এই ঘটনা কয়টি নিয়ে চিন্তা করলেই বোঝা যায়, সন্তানের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্নেহ-ভালবাসা কত গভীর ছিল।

সন্তানদের দুনিয়াবিমুখতার তরবিয়ত

সকল দরদী ও মমতাবান পিতাই সন্তানের কল্যাণ প্রত্যাশা করে, নিজ নিজ বিবেচনা অনুযায়ী। কারো কাছে আখেরাতের চিন্তা-ফিকির নেই বা থাকলেও তা গৌণ, দুনিয়াটাই মুখ্য। তারা সন্তানের জন্য দুনিয়ার কল্যাণের আকাংখা করে। কেউ অর্থ-বিত্তকে কল্যাণের চাবিকাঠি মনে করে নিজের সন্তানের জন্য সম্পদের প্রাচুর্যের আশা করে। কেউবা পদ-পদবীকে সফলতার মানদন্ড মনে করে সন্তানের উচ্চ পদে সমাসীন হওয়ার কামনা করে। যে জাগতিক শিক্ষাকে সফলতার বিন্দু বিবেচনা করে সে ছেলেমেয়েদেরকে শিক্ষার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করে। এভাবে যার বিবেচনায় যে বিষয় সুখ-শান্তি ও সফলতার মাধ্যম সে ঐ ক্ষেত্রে আপন সন্তানের সার্থক পদচারণার স্বপ্ন দেখে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পার্থিব কোনো বিষয়ই কল্যাণ ও কামিয়াবীর কেন্দ্রবিন্দু নয়। তাই জাগতিক কোনো বিষয়ের প্রতি তাঁর কোনো বাসনা ছিল না। দুনিয়া তো তাঁর নিকট মশার পাখা থেকেও হীন। [দ্র. সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৭২৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭৮৫] বরং ত্রুটিযুক্ত মৃত ছাগলছানা থেকেও তুচ্ছ। [দ্র. সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৯৫৭] তাঁর দৃষ্টিতে দুনিয়া ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের জায়গা নয়। বরং দুনিয়া ও দুনিয়ার বিলাস সামগ্রী হল প্রবঞ্চক, প্রতারক। সুতরাং এটাই স্বাভাবিক যে, তিনি সন্তানদের জন্য বিত্ত-বৈভব ও বিলাস সামগ্রি পছন্দ করবেন না।

এক্ষেত্রে আলী রা. ও ফাতেমা রা.-এর জীবন হল সুন্দর উদাহরণ। তাঁদের সংসারে দৈন্য ও অভাব-অনটন ছিল নিত্য বিষয়। সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম ফাতেমা রা. নিজ হাতে সম্পাদন করতেন। তিনি অনেক কষ্ট-ক্লেশের কাজ নিজে আঞ্জাম দিতেন। হাদীস ও সীরাতের কিতাবাদিতে সেসবের কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি নিজ হাতে যাতা চালাতেন। এরপর নিজেই রুটি তৈরি করতেন। যাতা চালাতে চালাতে তার উভয় হাতে ফোসকা পড়ে গিয়েছিল। (দ্র. সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৭০৫; জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৭০৭, ৩৭০৮; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৬৫৫১)

মশক দিয়ে পানি টানতে টানতে তাঁর গায়ে দাগ পড়ে গিয়েছিল। নিয়মিত আগুনে রান্না করাতে তাঁর জামা-কাপড় কালচে হয়ে থাকত এবং প্রত্যহ ঘর ঝাড়– দেওয়ায় তাঁর কাপড়-চোপড় ধুলা-ধূসরিত হয়ে যেত। (দ্র. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৯৮৮, ৫০৬৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৩১৩)

তাঁরা যে চাদরটা গায়ে দিয়ে ঘুমাতেন তা এত ছোট ছিল যে, পা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে যেত, মাথা ঢাকলে পা বেরিয়ে যেত। (দ্র. মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৮৩৮)

এভাবে ফাতেমা রা. কষ্ট-কঠিন জীবনযাপন করে যাচ্ছিলেন। এরই মাঝে একবার নবীজীর নিকট গনীমতের মাল এবং কিছু গোলাম এল। ফাতেমা রা. নবীজীর খেদমতে নিজের করুণ অবস্থার কিছু বিবরণ দিলেন এবং একজন খাদেমের আবেদন করলেন।
চিন্তা করুন, একজন পিতা, যার রয়েছে সন্তানের প্রতি হৃদয় উজাড় করা স্নেহ-মমতা, কলিজার টুকরা প্রিয় কন্যার এমন কষ্টের কথা শুনলে তার মনে কেমন তোলপাড় সৃষ্টি হতে পারে! নবীজী কী করলেন? এ প্রসংগে আলী রা. বলেন, রাতে নবীজী আমাদের ঘরে এলেন। আমি এবং ফাতেমার মাঝখানে আমাদের সাথে লেগে বসলেন এবং বললেন-
أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا أَوْ أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا فَسَبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ.
শোনো, তোমরা যা চেয়েছ তারচেয়ে উত্তম জিনিস কি তোমাদের বলব না? তোমরা যখন রাতে ঘুমানোর জন্য বিছানায় যাবে তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়বে। এটা তোমাদের জন্য খাদেমের চেয়ে উত্তম। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৩১১৩, ৫৩৬২, ৩৭০৫, ৫৩৬১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭২৭, ২৭২৮)

অপর বর্ণনায় এসেছে, তখন ফাতেমা রা. উত্তরে বলেছেন-
رَضِيتُ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَعَنْ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি সন্তুষ্ট। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৯৮৮)

শরীয়তের সীমার মাঝে থেকে শোভা-সৌন্দর্য গ্রহণ করাটা দূষণীয় নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্নেহের মেয়েদের জন্য এটাও পছন্দ করতেন না। ইবনে উমর রা. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সফর থেকে ফিরলে) সাধারণত প্রথমে ফাতেমা রা.-এর সাথে দেখা করতেন। একদা তিনি ফাতেমা রা.-এর গৃহে এলেন। তার দরজায় পর্দা ঝুলানো দেখে তিনি ভিতরে প্রবেশ করেননি। আলী রা. ঘরে এসে দেখেন ফাতেমা রা. মন খারাপ করে বসে আছে। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কী হয়েছে? বললেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উদ্দেশ্যে এসেছেন, কিন্তু আমার সাথে সাক্ষাৎ না করেই চলে গেছেন। আলী রা. নবীজীর খেদমতে এসে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি ফাতেমার সাথে দেখা করার জন্য গেলেন, এরপর দেখা না করে চলে এলেন! ফাতেমা এতে খুব কষ্ট পেয়েছে। তিনি বললেন-
وما أنا والدنيا؟ وما أنا والرقم؟ إِنِّي رَأَيْتُ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا مَوْشِيًّا.
আমার সাথে দুনিয়ার কী সম্পর্ক? আমার সাথে কারুকার্যের কী সম্পর্ক? আমি তার দরজায় নকশাকৃত পর্দা দেখেছি।

আলী রা. ফাতেমার কাছে এসে নবীজীর কথা শোনালেন। ফাতেমা রা. বললেন, আল্লাহর রাসূলকে বলুন, তিনি যা ইচ্ছা আমাকে নির্দেশ দিতে পারেন। তখন নবীজী বললেন, ফাতেমাকে বল, সে যেন পর্দাটি অমুক অভাবী পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দেয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস ২৬১৩; সুনানে আবু দাউদ, হাদী ৪১৪৯)

ফাতেমা রা.-এর বিয়ের অনেক অনেক দিন পরের ঘটনা। সাওবান রা. বলেন, একদিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমার গৃহে আগমন করলে ফাতেমা রা. গলা থেকে একটি স্বর্ণের হার খুলে নবীজীকে দেখালেন এবং বললেন, হাসানের পিতা (আলী রা.) আমাকে এটা হাদিয়া দিয়েছেন।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

يَا فَاطِمَةُ بِالْعَدْلِ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَفِي يَدِكِ سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ؟

এটা কি ইনসাফ হবে যে, মানুষ বলাবলি করবে, ফাতেমা হল মুহাম্মাদের মেয়ে, অথচ তোমার হাতে আগুনের হার?

ফাতেমা! এরপর ফাতেমাকে কঠিন ভর্ৎসনা করলেন এবং বের হয়ে চলে গেলেন। আর একটুও বসলেন না।

তখন ফাতেমা রা. হারটি বিক্রি করে দিলেন এবং এর মূল্য দিয়ে একটি গোলাম খরিদ করে তাকে আযাদ করে দিলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শুনে বললেন, ‘আল্লাহু আকবার’।

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي نَجَّى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর তিনি ফাতেমাকে আগুন থেকে রক্ষা করলেন। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২৩৯৮; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৫১৪০)

সন্তানদের নেক আমলের উৎসাহ প্রদানঃ

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো তাঁর উম্মতের সকল সদস্যের জন্যই ইহকালীন মুক্তি ও নিরাপত্তা এবং পরকালীন শান্তি ও সফলতার জন্য ব্যাকুল থাকতেন। সুতরাং তিনি স্নেহের কন্যাদের জন্য আখেরাতের অধিক সওয়াব ও মর্যাদার বিষয়ে চিন্তা করবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। তাই আদরের কন্যাদের সবরের অনুশীলন করানোর সাথে সাথে নেক আমলের প্রতিও উৎসাহ দিতেন।

অধিক সওয়াব ও মর্যাদার একটি আমল হল তাহাজ্জুদ নামায। কলিজার টুকরো সন্তান এর সুফল ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে- এটা কি মানা যায়? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ রাতে প্রিয় মেয়ে ফাতেমার গৃহে গিয়ে তাহাজ্জুদের জন্য জাগিয়ে দিতেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস ১১২৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৭৫)

আনাস রা. বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রা.-কে বললেন-

হে ফাতেমা! গুরুত্ব দিয়ে আমার উপদেশ শোনো। সকাল ও সন্ধ্যায় তুমি বলবে-

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلُّهُ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ.

[হে চিরঞ্জীব! হে মহানিয়ন্ত্রক! আমি তোমার রহমতের সাহায্য চাই। আমার সকল কর্ম ও অবস্থা শুধরে দিন। এবং এক পলকের জন্যও আমাকে নিজ দায়িত্বে ছেড়ে দিবেন না। (কখনো আপনার সাহায্য ও রহমত থেকে বঞ্চিত করবেন না।)] -সুনানে কুবরা, নাসায়ী, হাদীস ১০৩৩০; মুসনাদে বাযযার, হাদীস ৬৩৬৮

সারকথা, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ কন্যাদের খুব ভালবাসতেন, আদর-স্নেহে লালন-পালন করতেন। তাদের প্রতি অত্যধিক মহব্বতের কারণে তিনি চাইতেন না যে, আদরের দুলালীরা নিজেদের সৎকর্মের কিছু পুরস্কার দুনিয়াতেই ভোগ করে ফেলবে। তেমনিভাবে তারা যেন বেশি বেশি নেক আমল করে আখেরাতে সুউচ্চ মাকাম ও মর্যাদার অধিকারী হতে পারে, সে তামান্নাও করতেন।

সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ হল, পুত্র-কন্যাদের হৃদয় উজাড় করে ভালবাসা ও আদর-যত্ন করা এবং তাদের জন্য পার্থিব সুখ-শান্তি ও সফলতার তুলনায় আখেরাতের সুখ-শান্তি ও সফলতাকে প্রাধান্য দেওয়া। এ ক্ষেত্রে বাবা মা হিসাবে আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ মতো চলা উচিত।

সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা সংক্রান্ত মা বাবার ভুলভ্রান্তিঃ

সন্তান মা-বাবার কাছে আল্লাহ তাআলার এক মহা আমানত। এই আমানতের যথাযথ হক আদায় করা মা-বাবার কর্তব্য। কিন্তু অনেক মা-বাবাই সন্তানের তালীম-তরবিয়তের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না।

এর মূলে রয়েছেঃ

(এক) দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং সন্তান যে একটি মহা আমানত-এ বিষয়ে সচেতনতার অভাব।

(দুই) বিজাতীয় রীতি-নীতি ও ফ্যাশন প্রীতি।

(তিন) বৈষয়িক উপার্জনকেই জীবনের সাফল্য হিসেবে মনে করা।

এ কারণে সন্তানকে একজন ঈমানদার ও সাচ্চা মুসলমান হিসেবে গড়ে তোলার তাগিদ তারা বোধ করেন না। এ সকল মৌলিক চিন্তাগত ভ্রান্তিই সন্তানের তালীম-তারবিয়াতের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এ ছাড়া নিম্নোক্ত আরও কিছু কারণ আছে।

১। সন্তান আমানত-সম্পদ নয়ঃ

সন্তান মা-বাবার নিকট আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমানত। তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়া, শরীয়তের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি শেখানো এবং একজন ঈমানদার মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা মা-বাবা ও অভিভাবকের কর্তব্য। আজ বৈষয়িক শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং চাকরি ও উপার্জনক্ষম করে গড়ে তোলাকেই শুধু দায়িত্ব মনে করা হয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সন্তানকে হালাল ও বৈধ পন্থায় আয়-রোজগার শেখানোও পিতামাতার কর্তব্য। কিন্তু এটিই একমাত্র দায়িত্ব নয়; বরং তাদেরকে ইসলামী সভ্যতা (তাহযীব) শেখানো, দ্বীন ও শরীয়তের মৌলিক বিষয়াদি শেখানো এবং একজন দ্বীনদার-নামাযী ও প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাও মা-বাবার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

হাদীস শরীফে এসেছে;

‘জেনে রেখ, তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ তার পরিবারবর্গের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তাদের ব্যাপারে তাকে জবাবদিহি করতে হবে।’ (সহীহ বুখারী ১/২২২ হাদীস ৮৯৩)

সুসন্তান যেমন মা-বাবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের বড় সম্পদ এবং সদকা জারিয়া তেমনি সন্তান যদি দ্বীন ও শরীয়তের অনুগত না থাকে, দুর্নীতি ও গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়

তাহলে সে উভয় জগতেই মা-বাবার জন্য বিপদ। দুনিয়াতে লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও পেরেশানির কারণ। আর কবরে থেকেও মা-বাবা তার গুনাহর ফল ভোগ করতে থাকবে। আখিরাতে এই আদরের দুলালই আল্লাহ তাআলার দরবারে মা-বাবার বিরুদ্ধে আপিল করবে যে, তারা আমাকে দ্বীন শেখায়নি। তাদের দায়িত্ব পালন করেনি। তাই এই আমানতের হক আদায়ের প্রতি খুবই যত্নবান হতে হবে।

২। বিজাতীয় রীতিনীতি ও ফ্যাশন প্রীতি

কুরআন-হাদীসের একটি মৌলিক শিক্ষা হল, আচার-ব্যবহার, সাজসজ্জা, কৃষ্টি-কালচার ইত্যাদিতে ইসলামী স্বাতন্ত্রবোধ থাকা। এসব ক্ষেত্রে বিজাতীয় অনুকরণকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এটা দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিধান। এ সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে অসংখ্য হেদায়েত রয়েছে। হাদীস শরীফের 'কিতাবুল আদব' অধ্যায়ে এবং অন্যান্য প্রসঙ্গে বিধর্মীদের অনুকরণ না করার এবং কৃষ্টি-কালচারে তাদের বিরোধীতা করার অনেক তাকীদ এসেছে। একটি হাদীসে এসেছে- 'যে ব্যক্তি কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করল সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।'

সুতরাং শিক্ষা-দীক্ষা, ফ্যাশন ও রীতিনীতিতে বিজাতীয়দের অনুকরণ করা এবং সে অনুযায়ী সন্তানদের গড়ে তোলা বড় ধরনের ভুল। এতে ইসলাম ও ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন থেকে সে ধীরে ধীরে এমনিভাবে বের হয়ে যায় যার উপলব্ধিও থাকে না।

৩। কুরআন মজীদ না শেখানোঃ

একজন মুসলিম তার সন্তানকে আল্লাহর কালাম শেখাবে না এটা কি কল্পনা করাও সম্ভব? কিন্তু এদেশের অধিকাংশ মুসলমানের অবস্থাই এই। লাখ লাখ টাকা খরচ করে সন্তানের জন্য বড় বড় ডিগ্রী নেওয়া হচ্ছে কিন্তু কুরআন পড়ানোর দিকে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে না। কুরআন মজীদে এসেছে- (তরজমা :) 'রাসূল বলবেন, হে আমার রব, আমার কওম এই কুরআনকে পরিত্যাগ করেছে!' (সূরা ফুরকান ৩০)

স্বয়ং কুরআনের অভিযোগ করার কথাও এসেছে। তাই আমাদের অত্যন্ত সচেতন হওয়া কর্তব্য। সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত, এ ব্যাপারে ভেবে চিন্তে পদক্ষেপ নিতে হবে। তাদেরকে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বানালে সমস্যা নেই। কিন্তু তাদেরকে ঈমানদার বানানোও বাবা-মা এর কর্তব্য। সন্তান কুরআন পড়তে ও বুঝতে পারে এতটুকু যোগ্যতা তার মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। তাই শুধু ডাক্তার নয়; বরং দ্বীনদার ডাক্তার ও দ্বীনদার ইঞ্জিনিয়ার বানান। আর যদি দ্বীনের খাদেম আলেম বানাতে পারেন তবে তো আরও ভালো।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর রা.এর ছেলে আব্দুল্লাহ, যখন সূরা বাকারা সমাপ্ত করেছিলেন তখন বাবা খুশিতে উট যবাই করে সমাজের লোকদেরকে দাওয়াত করেছিলেন। আজ আমরাও মিষ্টিমুখ করি কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা হয় সন্তান খৃষ্টান মিশনারীদের নামি

দামি স্কুলে চান্স পেয়েছে এজন্য। সন্তান স্কলারশিপ পেয়ে ইসলামের জঘন্যতম শত্রু ইহুদীদের ইউনিভার্সিটিতে সম্পূর্ণ বৈরী পরিবেশে পড়ার সুযোগ পেয়েছে এজন্য।
তাই কলিজার টুকরা সন্তানের কচি সিনা বিধর্মীদের হাতে সোপর্দ না করে আসুন সাহাবায়ে কেরামের মতো আমরাও সন্তানকে আল্লাহ পাকের কালাম শেখাই। আসমান-জমিনের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র, নূরানী ও সবচেয়ে বরকতময় কালাম কুরআন মজীদ। তাহলে এ থেকে আমার সন্তানকে বঞ্চিত করব কেন? এই কচি মনে যদি আল্লাহর পবিত্র কালাম স্থান পেয়ে যায় তাহলে পরবর্তী জীবনে কখনও যদি সে প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হলেও অন্তরের এই নূর তাকে সৎ পথে চলতে সাহায্য করবে।

৪। দ্বীন না শেখানোঃ

সন্তানকে কুরআন শেখায় না এমন মা-বাবার হার যদি শতকরা ৭০ হয়ে থাকে তবে দ্বীন শেখায় না এদের হার শতকরা ৯০-৯৫ ভাগ। নামায কীভাবে পড়বে তাও শেখায় না। হালাল-হারাম, পাক-নাপাক, অযু-গোসল তো দূরের কথা। অথচ সন্তানকে দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি শেখানো পিতা-মাতার উপর ফরয। এটা না শেখানো সন্তানের উপর সবচেয়ে বড় জুলুম।
বাবা-মাকে এ ভুলের জন্য কিয়ামতের দিন চুলচেরা জবাব দিতে হবে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সতর্কবাণী : 'পুরুষ তার পরিবারবর্গের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। তাকে তাদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।' (সহীহ বুখারী ১/২২২, হাদীস ৮৯৩)

৫। সন্তানকে ইসলাম বিদ্বেষী করে গড়ে তোলা

আধুনিকতার লেহাজ করে অনেক মা-বাবাই তাদের সন্তানদেরকে ইসলামের আহকাম ও ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিদ্বেষী করে গড়ে তোলেন। টুপি-দাড়ি, আলিম-ওলামা, মাদরাসা-মসজিদ ইত্যাদি বিষয়ে একটা নেতিবাচক ধারণা। তাদের অন্তরে ঠাঁই পায় (নাউযুবিল্লাহ)। শৈশব থেকেই নাস্তিক প্রকৃতির শিক্ষক বাছাই করা হয়। উপরন্তু স্যাটেলাইট চ্যানেল, ইন্টারনেট এর অবাধ ব্যবহার তো আছেই। সাথে সাথে এ ধরনের লেখকদের বইপত্র পড়তে দেওয়া হয় এবং এই মানসিকতা সম্পন্ন লোকদের পরিবেশেই তাদের বিচরণকে বিচক্ষণতার সাথে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। এভাবে শিশুর মন-মানসকে বিষাক্ত করে দেওয়া হয়। এটা মারাত্মক ভুল। এজন্য পিতামাতাকে আল্লাহর দরবারে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে।

৬। শিশুর প্রথম পাঠশালাকে গুরুত্ব না দেয়াঃ

শিশুর প্রথম পাঠশালা হচ্ছে মায়ের কোল। এখানে সে জীবনের অনেক কিছু শেখে। পরবর্তীতে এটাই তার অভ্যাসে পরিণত হয়। শরীয়তে এই পাঠশালার অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় এই যে, শিশুর এই প্রথম শিক্ষা শুরু হয় টিভি দিয়ে। মা-বাবা তাদেরকে সাথে নিয়েই টিভি দেখে, ধীরে ধীরে এই ছোট বাচ্চাটি নাচ-গান থেকে শুরু করে সব ধরনের অশ্লীলতা শিখতে থাকে, বড় পুতুল নিয়ে খেলা করে, ঘুমায়। ফুলের মতো এই বাচ্চার জীবন কী দিয়ে শুরু হচ্ছে একটুও কি তা ভেবে দেখা হয়েছে। এ সবই ভুল। আমানতের খেয়ানত।

শরীয়তের আদেশ হল, ভূমিষ্ট হওয়ামাত্র শিশুর ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দিবে। যেন তার জীবন শুরু হয় আল্লাহর বড়ত্বের বাণী 'আল্লাহু আকবার' দিয়ে এর পর মা-বাবার দায়িত্ব হল সন্তানের ভালো অর্থবোধক নাম রাখা। বাচ্চা কথা বলা শিখলে তাকে সর্বপ্রথম আল্লাহর নাম শেখানোর চেষ্টা করা উচিত। যিনি এই সন্তান দান করলেন এরপর তাকে বাকশক্তি দিলেন তার নাম সর্ব প্রথম শেখানোই কৃতজ্ঞ বান্দার পরিচয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'সন্তানকে প্রথম কথা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শেখাও এবং মৃত্যুর সময় তাদেরকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর তালকীন কর।' (শুআবুল ঈমান ৬/৩৯৭-৩৯৮, হাদীস ৮৬৪৯)

বাচ্চা বয়সেই অল্প অল্প করে আল্লাহর পরিচয় শেখানো, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম শেখানো, গল্পে গল্পে তাঁর পরিচয় ও আখলাক তুলে ধরা পিতামাতার কর্তব্য। এককথায় তার জীবনের প্রথম পাঠশালা থেকে সে যেন দ্বীনের শিক্ষা অর্জন করে তা আমাদের কাম্য হওয়া উচিত। ছোট ছোট আদব-কায়দা, যেমন ডান হাতে তিন শ্বাসে বসে পানি পান করতে শেখাবে। জুতা পরিধান করতে আগে ডান পা এবং খোলার সময় আগে বাম পা খোলা। বাথরুমে ঢোকার সময় আগে বাম পা, বের হওয়ার সময় ডান পা ইত্যাদি শেখার উত্তম সময় এই শৈশবটাই। ঘুমের দুআ, ঘুম থেকে ওঠার দুআ, খাওয়ার দুআ ইত্যাদি সহজ বিষয়গুলো এবং ছোট ছোট ব্যবহারিক সুন্নতে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলার সময় এখনই। আর এটার দায়িত্ব মা-বাবার।

৭। সন্তানের জন্য বিধর্মীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিধর্মী শিক্ষককে প্রাধান্য দেওয়াঃ

আমাদের দেশের সর্বত্র খৃষ্টান মিশনারীদের বহু স্কুল রয়েছে। তবে এসব স্কুলের অধিকাংশ ছাত্রই মুসলমান। শিক্ষকদের মধ্যে বিধর্মী এবং মুসলমান উভয় ধরনের রয়েছে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে শিক্ষা কারিকুলাম, ড্রেস ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত হয় মিশনারী কর্তৃক।

এগুলোতে পড়ার দ্বারা ছাত্রের একদিকে যেমন ধর্মের প্রতি বিরূপ মনোভাব নিয়ে বেড়ে উঠে অন্যদিকে সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তাদের ভবিষ্যৎটা ঐভাবেই গড়ে উঠে।

আজকাল এদের অনুকরণে মুসলমানদের তত্ত্বাবধানেও কিছু কিছু স্কুল পরিচালিত হয়। সেখানে বাহ্যিক অশ্লীলতা আরো এক কাঠি বেশি। সন্তানের জন্য এমন স্কুল নির্বাচন করা বড় ধরনের ভুল।

একজন সাধারণ মুসলমানের এটুকু সচেতনতা ও আত্মমর্যাদা বোধ থাকা চাই যে, নিজের সন্তানকে কোনো বিধর্মীর হাতে তুলে দিবে না। লক্ষ করে দেখুন তো কোনো ইহুদী বা খৃষ্টান কি তার সন্তানকে কোনো মুসলিমের হাতে তুলে দেয়? তারা এ বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারে যে, ছাত্রের উপর তার শিক্ষকের অনেক ধরনের প্রভাব পড়ে। বিশেষ করে পরিণত বয়সের আগে তো শিক্ষকের অনেক কিছুই ছাত্রের হৃদয়পটে অংকিত হয়ে যায়। তাই সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য দ্বীনী মাদরাসাই সবচেয়ে উপযোগী। কিন্তু কেউ যদি এতটুকু না পারেন তবে অন্তত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শিক্ষকমন্ডলী এবং ধর্মীয় ভাবধারার স্কুল নির্বাচন করা কর্তব্য। এক্ষেত্রে অভিভাবকের ভুল পদক্ষেপ সন্তানের জন্য বড় ধরনের সর্বনাশ ডেকে আনে।

এ পর্যায়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে।

তিনি ইরশাদ করেন,

‘প্রত্যেক শিশু (ইসলামের) ফিতরতের উপর জন্মলাভ করে। কিন্তু পিতা-মাতা তাকে ইহুদী বানায়, খৃষ্টান বানায়, অগ্নিপূজক বানায়। (সহীহ বুখারী ১/১৮৫, হাদীস ১৩৮৫; সহীহ মুসলিম ২/৩৩৬, হাদীস ২৬৫৮)

৮। কেবলমাত্র উপার্জন কেন্দ্রিক শিক্ষা নির্বাচনঃ

আজকাল শিক্ষাকে পেশা হিসেবে অবলম্বন করা হয়ে থাকে। যে শিক্ষায় বেশি টাকা আয় করা যাবে সেটাই চাই। তা হোক না কেন যতই অসার। আবার যে পড়া পড়ালে এমন চাকরি করা যায় যেখানে মূল বেতনের পাশাপাশি অবৈধ ইনকামের পথ খোলা রয়েছে,সেটাকে সাগ্রহে নির্বাচন করা হয়। অর্থাৎ অভিভাবকগণও সন্তানকে শিক্ষিত বানানোর উদ্দেশ্য থাকে বেশি বেশি আয়। ফলে সন্তান ধীরে ধীরে সেবার মানসিকতা ছেড়ে কমার্শিয়াল মানসিকতার হয়ে গড়ে উঠে।

আমার এক আত্মীয় বড় ইঞ্জিনিয়ার। সে অসৎ আয় করে না। এতে তার বাবা-মা তেমন সন্তুষ্ট নন। কেননা তার গ্রামের অন্যান্য ইঞ্জিনিয়াররা কত বড় বড় বিল্ডিং করল কিন্তু সে কিছুই করতে পারছে না। এই হল অভিভাবকদের শিক্ষা। এসবই ভুল।
শিক্ষাকে মানুষ হওয়ার জন্য, দেশ ও দশের সেবার মানসিকতা নিয়ে শিখতে হবে। তবেই তা হবে শিক্ষা। এই দৃষ্টি ভঙ্গি অর্জন করা গেলে নিজের ও জাতির উপকার হয় এমন বিদ্যা শেখার সুযোগ হবে। সাথে সাথে মানুষ গড়ার আসল শিক্ষা কুরআন ও হাদীস শেখারও সুযোগ বের হয়ে আসবে।

৯। উচ্চ শিক্ষার জন্য অমুসলিম দেশে গমন

অনেক মা-বাবাই সন্তানকে উচ্চ শিক্ষার জন্য অমুসলিম দেশে পাঠিয়ে থাকেন। প্রশ্ন এই যে, এই সন্তান কি সেখান থেকে শুধু উচ্চ ডিগ্রীই নিয়ে আসবে? নাকি সঙ্গে করে ধর্মদ্রোহিতা ও নাস্তিকতাও নিয়ে আসবে, তা কি কখনও ভেবে দেখেছেন তার অভিভাবকগণ? মসজিদে ওই সন্তানের জন্য হুজুরের কাছে দুআ চাওয়া হয় কিন্তু কখনও কি হুজুরের কাছে এ সম্পর্কিত মাসআলা জেনেছেন যে, ওই সব দেশে উচ্চ ডিগ্রী কিংবা উপার্জনের উদ্দেশ্যে যাওয়ার হুকুম কী? মাসআলা হল, বৈরী পরিবেশে গিয়ে যে ব্যক্তি ইসলামী আদর্শের উপর অবিচল থাকতে পারবে না তার জন্য সেখানে যাওয়ার কোনো অনুমতি নেই। সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও হারাম। কেননা, এতে ইচ্ছা করেই নিজেকে গুনাহ ও কুফুরীর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়।

১০। সন্তানের স্বাধীনতার নামে তাকে মুক্ত ছেড়ে দেওয়াঃ

আজ সুশীল সমাজ সন্তানের ব্যাপক স্বাধীনতার প্রবক্তা। এই নীতি ইউরোপ-আমেরিকা থেকে আমদানীকৃত। যখন সন্তানের আখলাক চরিত্র গড়ার সময় তখন তাকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হয়। সে ভালো-মন্দ পরিবেশে মিশে যখন যার সাথে ইচ্ছা ঘুরাফেরা করে। ইন্টারনেটে সব ধরনের প্রোগ্রাম দেখতে থাকে। ধীরে ধীরে সে নানা ধরনের মন্দ প্রবণতায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। পরবর্তীতে এই সন্তানই মা-বাবার কষ্টের কারণ হয়ে দাড়াঁয়। সময়মতো শাসন না করার কারণে বড় হয়ে বাবা-মার অবাধ্য হয়ে যায়। তাই এই ধরনের স্বাধীনতা দুনিয়াতেও সন্তান এবং পরিবার কারো জন্য সুখের কারণ হয় না। এর ফলে সমাজে বিশৃংখলা ও অপরাধ বৃদ্ধি পায় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের এক বৃহৎ অংশ ধ্বংসের মুখে নিপতিত হয়ে যায়।
আজ সমাজে বিভিন্ন ধরনের স্কুল রয়েছে। রয়েছে মাদক নিরাময় স্কুলও। এ জাতীয় স্কুলের সবকটিতে প্রচুর ছাত্র ভর্তি হচ্ছে। এরা ঐ সকল সন্তান, যাদেরকে মা-বাবা সময়মতো

নিয়ন্ত্রণ করেননি। সন্তানকে মন্দ ও অসৎকাজ থেকে বাধা দেননি। ফলে সে ধীরে ধীরে অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়েছে। সুতরাং সন্তানকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া একটি অসুস্থ চিন্তা। ভুল পদক্ষেপ। শরীয়ত বলে, সন্তান মা-বাবার কাছে আল্লাহর আমানত। তার আখলাক-চরিত্র গড়ার দায়িত্ব মা-বাবারই। সময় মতো তাকে শাসন করা, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা, সৎ ও দ্বীনী পরিবেশে রাখা তাদের নৈতিক দায়িত্ব।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ... সন্তানের বয়স সাত বছর হলে তাদের নামাযের আদেশ দাও, দশ বছর বয়সে নামাযের জন্য শাসন কর এবং এ বয়সে তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।' (মুসনাদে আহমদ ২/২১৮, হাদীস ৬৭৫৬; সুনানে আবু দাউদ ১/৭১, হাদীস ৪৯৪)

সন্তানকে একেবারে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া যাবে না; বরং বুঝের বয়স হওয়া থেকেই তাকে পরিমিত শাসনের মধ্যে রাখার ব্যাপারে এ হাদীস সুস্পষ্ট দলীল। এছাড়া সাহাবা, তাবেঈন থেকে বহু বর্ণনা রয়েছে যে, মা-বাবার দায়িত্ব এবং কর্তব্য হল, সন্তানকে দ্বীন শেখানো, মন্দ কাজ ও মন্দ পরিবেশ থেকে দূরে রাখা। শুধু কি তাই? সন্তানের পরিণত বয়সে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করাও তাদের দায়িত্ব। যেন তারা কোনো পাপাচারে লিপ্ত না হয়ে যায়। অভিভাবকদের শীথিলতার কারণে সন্তান যদি কোনো গুনাহে জড়িয়ে পড়ে তবে এর জন্য দায়ী হবেন অভিভাবকগণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যার সন্তান রয়েছে সে যেন তার সুন্দর নাম রাখে এবং তাকে উত্তম চরিত্র শেখায়। যখন সে বালেগ হবে তখন তার বিয়ে দেয়। বালেগ হওয়ার পরও যদি বিয়ে না দেয় আর সে কোনো গুনাহ করে ফেলে তবে তার এ গুনাহ তার পিতার উপর বর্তাবে।' (শুআবুল ঈমান, বায়হাকী ৬/৪০১, হাদীস ৮৬৬৬)

সুতরাং বর্তমান প্রেক্ষাপটে স্বাধীতার অজুহাতে সন্তানকে মুক্ত ছেড়ে দেওয়া তাকে ধ্বংস করারই নামান্তর। বিশেষ করে নিম্নোক্ত বিষয়ে উদারতা করা সন্তানের নিশ্চিত ধ্বংসের কারণ :

১১। অসৎ সংশ্রব অবলম্বনে বাধা প্রদান না করাঃ

সহপাঠী হোক কিংবা প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের মধ্যে দুঃশ্চরিত্র ছেলে-মেয়েদের সাথে মেলামেশা করার ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া। যখন যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে মিশতে দেওয়া। এতে তাদের খারাপ চরিত্র অতি দ্রুত সন্তানের মধ্যে চলে আসে এবং সেও এক সময় তাদের মতো বা তাদের চেয়ে আরো খারাপ হয়ে যাবে।

১২। ডিশ এন্টিনা, ইন্টারনেট এর অশ্লীল প্রোগ্রাম দেখতে বাধা না দেওয়াঃ

ডিশ এন্টিনা, ইন্টারনেট এর অশ্লীল প্রোগ্রাম, সিনেমা, টেলিভিশন, অশ্লীল ছবি, নাচ-গান ইত্যাদি দেখতে বাধা না দেওয়া বা এক্ষেত্রে ছাড় দেওয়াও ধ্বংসাত্মক। এতে সন্তান পড়ালেখার পরিবেশ থেকে দূরে সরে যায় এবং তার স্বভাব-চরিত্রে অশ্লীলতা প্রবেশ করতে থাকে। ধীরে ধীরে সে বাবা-মার অবাধ্য হয়ে পড়ে এবং অশ্লীল কাজে জড়িয়ে পড়ে।

১৩। পর্দার বিষয়ে ছাড় দেওয়াঃ

ঘরে-বাইরে সর্বত্র শরয়ী পর্দা রক্ষা করা ফরয। কিন্তু তথাকথিত মডার্ন ফ্যামিলী শরীয়তের এ হুকুমের প্রতি শীথিলতা করে থাকে। নিজেরা যেমনি পর্দা করে না তেমনি সন্তানকেও পর্দায় থাকার আদেশ দেয় না। এর কারণে সমাজের বিভিন্ন স্তরে গুনাহ ব্যাপক হচ্ছে। সন্তানের চরিত্র ধ্বংস হওয়ার এটি একটি বড় কারণ। তাই এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

১৪। মাহরাম নয় এমন ছেলে-মেয়েদের একসাথে মিশতে বাধা না দেওয়াঃ

ছেলেদেরকে মাহরাম নয় এমন মেয়েদের সাথে মিশতে দেওয়া এবং মেয়েদেরকে ঘরের বাইরে একাকী যাওয়ার অনুমতি দেওয়া এবং তাদেরকে এ ব্যাপারে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়াও ধ্বংসাত্মক। আল্লাহ তাআলা সঠিক বুঝ দান করুন।

সর্বোপরি মা-বাবা তাদের সন্তানকে ইসলামের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিতে হবেঃ

আমরা যদি আমাদের আগামী প্রজন্মকে মুসলমান হিসেবে দেখতে চাই তাহলে আমাদের মা-বাবাদের এই সংকল্প করতে হবে যে, তারা তাদের সন্তানদের ইসলামের সঙ্গে পরিচিত করবেন। আপনার সন্তানের স্কুলে যাওয়া যদি অপরিহার্য হয় তবে যেতে দিন, কিন্তু সকালে বা সন্ধ্যায়, কোনো এক সময় তার দ্বীনী শিক্ষার ব্যবস্থা করুন। সন্তানের মুখ থেকে কালেমা শুনুন-সে শুদ্ধ করে কালেমা বলতে পারে কি না। খোঁজ নিন, এ পরিমাণ কুরআন তার মুখস্থ আছে কি না যার দ্বারা নামায পড়া যায়।আমরা যদি এখনই এ বিষয়ে সচেতন না হই তাহলে এ দেশের ভবিষ্যৎ আশংকাজনক। সন্তানের দ্বীন ও ঈমান রক্ষায় সচেতন হতে হবে। হৃদয়ের গভীরে তাওহীদ ও রিসালাতের বিশ্বাস বসিয়ে দিতে হবে। আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সর্বশেষ রাসূল। সন্তানকে প্রকৃত মুসলমান বানাতে হবে এবং তাদেরকে মুসলমান হিসেবে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দিতে হবে। তাকে কুরআন মজীদ পড়তে শেখাতে হবে। তার অন্তরে তাওহীদের বিশ্বাস বসিয়ে দিতে হবে। শিরক-বিদআত থেকে, মূর্তিপূজা থেকে এবং সকল ভ্রষ্টতা থেকে তাদেরকে আগলে রাখতে হবে।

আমরা যদি এ কাজটুকু করতে সক্ষম হই তবে এতে দ্বীনের হেফাযতের অনেকখানি নিশ্চয়তা রয়েছে। অন্যথায় শুধু বাইরের তৎপরতা, সাংগঠনিক কাজকর্ম, পত্র-পত্রিকা, বই-পুস্তক, সেমিনার-কনফারেন্স ইত্যাদির দ্বারা-কিছু সুফল পাওয়া গেলেও-দ্বীন রক্ষার উদ্দেশ্য পূরণ হবে না।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে যদি আমরা আমাদের সন্তানদেরকে গড়ে তুলতে পারি , তাহলে তারা আদর্শ সন্তান হিসেবে গড়ে উঠবে এবং আমাদের নাজাতের ওসীলা হবে। সন্তানও জাহান্নাম থেকে বাচবে আমরাও পরকালে নাজাত পাবো। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আসুন, আমরা আমাদের সন্তানদেরকে নেকসন্তান হিসাবে গড়ে তুলি।

যে সম্পর্কে হাদিসে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ«ٍ

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার যাবতীয় আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে আমল বন্ধ হয় না-

১। সদকায়ে জারিয়া
২। এমন জ্ঞান-যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়
৩। এমন নেক সন্তান- যে তার জন্য দো'আ করে (সহিহ মুসলিম:১৬৩১)

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সন্তানদেরকে কবুল করুন, তাদের হকসমূহ যথাযথভাবে পালন করার তাওফীক দিন। আমিন

তথ্যসূত্রঃ

মাসিক আলকাউসার

মাসিক আত-তাহকীক

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য লেখক ডঃ মোঃ হারুন রশিদ

দৈনিক কালের কন্ঠ

দৈনিক প্রথম আলো